তারুণ্য

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ
পাঁচ সিকা

মুদ্রাকর
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা

তারিখ পত্র

—— পরিষৎ গ্রন্থ

১৫ দিনের মধ্যে ফেরত

...নের ...খ	গ্রহণের তারিখ

আমার দেশের ...কালের

তরুণ-তরুণীকে

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে "তারুণ্য" লেখা হয়। তখন আমি ইংলণ্ডে। ইচ্ছা ছিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরীক্ষা করে দেখব আমার মতবাদ বা আন্তরিক বিশ্বাস কী পরিমাণে বিবর্ত্তিত বা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। পরীক্ষার মাপকাটি হবে "তারুণ্য"। বছর সাত আট পরে "তারুণ্য" পড়ে মনে হলো পূর্ববর্ত্তী মত-বিশ্বাসের সঙ্গে আমার পরবর্ত্তী মতবিশ্বাস বহু বিষয়ে মিলছে না। সেইজন্য "তারুণ্য"র প্রথম চারটি প্রবন্ধের সঙ্গে আরো কয়েকটি রচনা জুড়ে "আমরা" নামে একখানি আলাদা বই বার করি। "তারুণ্য" যে আবার কখনো ছাপা হবে এ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু বইখানার চাহিদা আছে বলে মনে হচ্ছে আমার প্রথম যৌবনের মর্ম্মবাণীর হয়তো কোনো মূল্য আছে। "তারুণ্য"র বর্ত্তমান সংস্করণ প্রথম সংস্করণের অনুবর্ত্তী হলেও স্থলে স্থলে লেখনীক্ষেপ করেছি।

২রা নভেম্বর, ১৯৫৭ — অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

তারুণ্য

তারুণ্য ধর্ম্ম

রোজ সকালে উঠে আমাদের এই অতি পুরাতন প্রকৃতি সুন্দরীর সজ্জাটা যখন দেখি তখন একবারো কি মনে হয় ইনি আমাদের বড়ো প্রাচীনা বড়ো প্রবীণা বড়ো মাননীয়া ঠাকুমা'টি? চুপি চুপি বল্‌ছি, বরং মনে হয় ইনি ঠাকুমার নাৎবৌ বুঝি বা! এই প্রথম এঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘট্‌ল, শ্রীঅঙ্গে এঁর নব বধূর সাজ।

আজকের এই ষোড়শী প্রকৃতির দিকে চেয়ে চোখে আর পলক পড়ে না। চোখের অপরাধ কি, বলো? চোখ তো নিত্য নূতনের প্রেমিক। যে তার প্রেমের মূল্য বোঝে সে আপনাকে নিত্য নূতন করে দেখায়। আমাদের এই প্রকৃতি ঠাকুরুণ সেই সঙ্কেতটি জানেন বলে এঁর কোটী মন্বন্তরের বয়সটাকে এমন বেমালুম কাঁচাতে পারেন যে আমাদের তো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ইনি আমাদের চেয়ে একটা দিনেরো বড়ো। এই চিরযৌবনা উর্ব্বশী একদিন বিক্রমের সমবয়সিনী ছিল, আজ অর্জ্জুনের সমবয়সিনী। এর কাছে পূর্ব্বপুরুষ উত্তরপুরুষ সমানই, চিরকাল এ পুরুষের প্রেয়সী।

যা সনাতন তা যুগে যুগে নূতন। পুরাতনত্বের জাঁক সে করে না। তার বয়স কতো সে পরিচয় তার মুখে লেখা নেই, সে পরিচয়ের জন্যে মাটী খুঁড়্‌তে হয়, পাথর মাপ্‌তে হয়, ভূ-তত্ত্ব খ-তত্ত্বের পাঁজি পুরাণ ঘাঁট্‌তে হয়। এত করেও প্রমাণ হয় না এই অনাদি কালের অসীমা প্রকৃতির বয়স কতো, যার বয়সের হিসাব চলে সে এর এক এক প্রস্থ সাজ, এক একটা দিনের বহির্ব্বাস। কোটী গ্রহতারার কোটী বৎসর পরমায়ু অখণ্ড সৃষ্টির অনাদ্যন্ত আয়ুর তুলনায় তুচ্ছ।

যা সনাতন তা নূতনের মধ্যে ফিরে ফিরে সত্য, ফিরে ফিরে স্বপ্রকাশ। মিথ্যা কেবল ঐ পুরাতনটা, ঐ ছাড়া শাড়ীখানা, ঐ ঝরাপাতা মরা পাতার রাশ। ও যখন নূতন ছিল তখন সত্য ছিল, তখন সনাতন ছিল। ওর দিন ও নিঃশেষে ভোগ করেছে, ওর জীবনের একটাও দিন ও বাদ দেয়নি। এখন তবে ও কিসের অধিকারে ভূত হয়ে চেপে বসতে চায়, চিরদিনের হতে চায়? যে বারে বারে নূতন হয়, জন্মে জন্মে বাঁচে সে তো পুরাতন পাতা নয় সনাতন সজ্জা, সে তো যৌবনাস্তিম জরা নয়, যৌবনায়মান প্রাণ। প্রকৃতিরই ষোড়শী হবার অধিকার আছে, আমাদের ঠাকুমা'র নেই। তবু যখন ঠাকুমা অবুঝের মতন আব্দার ধরেন, "নাতির মধ্যে আমি বাঁচ্‌ব", তখন আব্দারকে আমরা অধিকার বলিনে, সে অনধিকার চর্চ্চাকে আমরা উৎপাত বলি। আমরা বলি, "বড়ো দুঃখিত হলুম, ঠাকুমা। কিন্তু নিজেদের জীবনটাকে আমরা নিজেরাই বাঁচাবো ঠিক করেছি। আমরা চিরপুরুষের নব অবতার, আমরা পূর্ব্বপুরুষের পুনর্মুদ্রণ নই, ঠাকুমা।"

অনাদি অনন্ত কালের শাখায় যে পাতাগুলি এক-বসন্তে ধরে-

ছিল তারা যখন বলে, "আর-বসন্তের পাতাগুলোর আমরা পূর্ব্ব-পুরুষ, তাদের মধ্যে আমরা নিজেদের দেখ্‌বো ; ন হি পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ; তাদের আর কোনো কর্ম্ম নেই ; কেবল আমাদেরি প্রীত্যর্থে প্রাণধারণ ; তাদের আর কোনো ধর্ম্ম নেই, কেবল 'পিতা স্বর্গঃ আর জননী স্বর্গাদপি" ; তখন নূতন পাতাদের হাসি পায়। তারা বলে, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কিসের সম্বন্ধ ? শুধু পরম্পরাগত সম্বন্ধ বই তো নয় ! তোমরা আগে বেঁচেছ, আমরা পরে বাঁচ্‌ছি। অনাদিকালের অনুপাতে আগে বাঁচার মূল্য যা অনন্তকালের অনুপাতে পরে বাঁচার মূল্য তাই। তোমাদের মধ্যে যদি আমরা না বেঁচে থাকি তো আমাদের মধ্যে কেন তোমরা বাঁচবে ? আমাদের ফরমাস্‌ যদি তোমরা না খেটে থাকো আমাদের প্রত্যাশা যদি তোমরা না পূরিয়ে থাকো, আমাদের সাধ যদি তোমরা না মিটিয়ে থাকো তবে তোমাদের ফরমাস, কেন আমরা খাট্‌তে যাবো, তোমাদের প্রত্যাশা কেন আমরা পূরাতে যাবো, তোমাদের সাধ কেন আমরা মেটাতে যাবো ? আমাদের হাতে মাত্র একটি বসন্ত, একটু বর্ত্তমান। এটুকু জীবনক্ষণ আমরা নিজেদেরি ইচ্ছামতো নিজেদেরি সাধ্যমতো বাঁচতে চাই, আমরাই আমাদের কাছে সকলের চেয়ে সত্য। যা যায় তা পুরাতন, তা প্রাণ-নিঃস্ব। যা রয় তা সনাতন, তা চিরপ্রাণ। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষের কিছুই রইলো না, চির পুরুষের সকলি রইলো।"

"কিন্তু আমরা যে তোমাদের প্রাণ দিয়েছি, জ্ঞান দিয়েছি, সমাজে স্থান দিয়েছি !—"

"দিয়ে, দেবার আনন্দ উপলব্ধি করেছো। পিতা হবার, গুরু

হবার, সমাজসেবী হবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করেছো। সে উপলব্ধি ও সে লাভ আমাদেরি কাছ থেকে লব্ধ। ঋণ গ্রহণ করেই আমরা ঋণ শোধ করেছি, পিতৃঋণ ঋষিঋণ দেবঋণ থেকে আমরা মুক্ত।"

"তোমাদের যে আমরা ভালোবাসি, সে ঋণ থেকে!"

"সে ঋণ দুই তরফা। তা বলে ভালোবাসার নামে অনধিকার চর্চ্চা চল্‌বে না। আগে স্বাধীনতা, তারপরে প্রেম।"

নূতন পাতারা বলে বটে একথা, কিন্তু বৎসর না ঘুর্‌তেই ভুলে যায়। পরের বসন্তে তাদেরো মুখে সেই প্রাচীনতম বুলি। এমনি করে যুগের পর যুগ যায়, যুগের আগে যুগ আসে। কিন্তু জরা যৌবনের সেই অনাদি কালের দ্বন্দ্বটা অনন্তকালেও থাম্‌বার নয়। সেটাও নিত্য সনাতন।

মৃত্যুর চেয়ে জরা ভীষণ। অনবচ্ছিন্ন যৌবন প্রবাহের মৃত্যু একটা বাঁক, জন্ম তার উল্টোপিঠ। কিন্তু জরা তার চড়া. তাকে তিলে তিলে শোষণ করে, নিঃস্বত্ব করে। মৃত্যুর পরেও যৌবন আছে, কিন্তু জরার মধ্যে যৌবন নেই। যৌবন যেন ঠাস্‌-বুনন, মৃত্যু তাকে যেখান থেকেই ছিঁড়ে নিক্—সে অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ। আর জরা যেন জাল-বুনন, যত দীর্ঘই হোক্ ফাঁকে ফাঁকা। "One crowded hour of glorious life" হচ্ছে যৌবন, "an age without a name" হচ্ছে জরা।

সেই জন্যে যৌবনের সত্যিকার বিপদ মরা নয় জরা, বদ্‌লানো নয় বদ্ধ হওয়া, ভাঙা নয় বাঁকা, নষ্ট হওয়া নয় স্বভাব-ভ্রষ্ট হওয়া। প্রতি বৎসর বিশ্ব-জরার সঙ্গে বিশ্ব-যৌবনের দ্বন্দ্ব বাধে, যৌবন আক্রমণ কর্‌বার দ্বারা আত্মরক্ষা করে, জরা আত্মরক্ষার আশায়

হটতে হটতে যায়, যৌবন আপনাকে বাড়াতে গিয়ে বাঁচে, জরা আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে মরে। শীতের শুষ্কপাতা ঝরিয়ে দিয়ে বসন্তের কিশলয় দেখা দেয়, জ্যৈষ্ঠের জীর্ণমাটী ভাসিয়ে নিয়ে শ্রাবণের বন্যা তাজা মাটী বিছিয়ে যায়। একের মরণ, অপরের জন্ম। কিন্তু উভয়ের ভিতর দিয়ে একই যৌবনের উষ্ণ রক্ত প্রবাহ।

এই উষ্ণ রক্ত প্রবাহ না হলে যৌবন বাঁচে না। তার বাঁচা তো কায়ক্লেশে বেঁচে বর্ত্তে থাকা নয়, ক্ষীণজীবীদের পিণ্ডার্থে ক্ষীণতর জীবীদের বংশান্বয় রক্ষা নয়, বালুকাগ্রস্ত ফল্গুপ্রবাহের মতো জরাগ্রস্ত অস্তিত্বটুকুকে অতি সন্তর্পণে টিকিয়ে রাখা নয়। তার বাঁচা আপনাকে প্রবলভাবে জাহির করা—দিকে দিকে, প্রগাঢ়ভাবে বইয়ে দেওয়া—স্রোতে স্রোতে। তার প্রতিভার আত্মপ্রকাশ সর্ব্বতোমুখী, তার প্রেমের আত্মোপলব্ধি সর্ব্বরসে। এমন বাঁচায় বিঘ্ন আছে, বিপদ্ আছে, মরণ আছে, কিন্তু পরোয়া নেই, হিসাব নেই, আফ্‌শোষ নেই। যার প্রচুর আছে সে প্রচুর উড়িয়ে দিতে পারে, জীবন খোয়ালেও তার জীবনের অভাব হয় না। প্রাণহানি নয় প্রাচুর্য্য-হানিই তার মৃত্যু, প্রাণ রক্ষা নয়, প্রাচুর্য্য রক্ষাই তার সমস্যা।

Struggle for existence যার সমস্যা সে নিছক্ প্রাণী, প্রাণের উপরে উদ্বৃত্ত তার নেই। সে বৃদ্ধ, তার বৃদ্ধি পরিমিত, তার ভাবনা অভাবাত্মক। সে নিজেকে বাঁচাবে বলে নিজেরকে ত্যাগ করতে করতে চলে, কচ্ছপের মতো আকাশকে ছাড়ে আপনাকে ঢাকে, অর্জ্জনের উপরে নয় সঞ্চয়ের উপরে বাস করে। সে যতটুকু চলে তার বেশী দ্বিধা করে, যতটা দ্বিধা করে তার বেশী সন্দেহ করে, যতটা সন্দেহ করে তার বেশী ভয় করে। জীবনের জারক-রস তার ফুরিয়ে এসেছে, সে গ্রহণ করতে, পরিপাক করতে

পারে না ; আত্মসাৎ কর্‌তে, বৃদ্ধি পেতে পারে না। সন্ধান কর্‌বার অক্লান্ত উৎসাহ তার নেই, জয় কর্‌বার উন্মাদ সংকল্প তার নেই। সে শেখানো মন্ত্র নিষ্ঠার সহিত জপ করে, পায়ের চেয়ে লাঠির পরে ভর করে বেশী।

তার সত্য নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সত্য, যে সত্য মায়ামৃগের মতো ধরাছোঁয়ার নিত্য অতীত নয়, যে সত্যে নিত্য অভিসারের অসহ্য শ্রম, অসহ্য ব্যর্থতা ও অসহ্য কলঙ্ক নেই, যে সত্য সদ্যফলপ্রদ স্বপ্নাদ্য মাদুলীর মতো সস্তা এবং বুড়ো ভোলানো। তার প্রেমের আদর্শে প্রেমাস্পদকে অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে তপস্যার দরকার করে না, রক্ষা কর্‌বার জন্যে পুনর্তপস্যার তাগিদ নেই, সমৃদ্ধ কর্‌বার জন্যে তপস্যারো যা অধিক সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার নবনবোন্মেষ নেই। সর্ব্বাগ্রে জাতি কুল বিত্ত প্রতিপত্তি, তারপরে কর্ত্তৃজনের সুখ সম্মান সুবিধা, তারপরে নিজের রূপগুণের পছন্দ। তারপরেও যদি এতটুকু ফাঁক থাকে তবে অত্যন্ত নিরাপদ একান্ত ভ্রমপ্রমাদহীন সম্পূর্ণ ট্যাকসই বেড়া-দেওয়া চিহ্নৎ-করা সাধু-সম্মত প্রেম! সতর্কতার আর অন্ত নেই! পৃথিবী সুদ্ধ তার প্রতিকূল। গায়ে একটু বাতাস লাগ্‌লে হাড় ক'খানা পর্য্যন্ত এমন খটাখট্ আওয়াজ করে ওঠে যে চৌচির হয়ে খুলে পড়্‌বে বুঝি বা! গেল! গেল! গেল! প্রাণ গেল! মান গেল! ধর্ম্ম গেল! সমাজ গেল! এবং ইদানীং শোনা যাচ্ছে, সাহিত্য গেল! যদি বলি, গেল তো আপদ্ গেল, কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, আবার আসবে,—তবে অক্ষমের না আছে ক্ষমতা না আছে বিশ্বাস না আছে আশা, আছে কেবল হাহুতাশ আর অভিশাপ।

Struggle for intense living—তার সমস্যা যে প্রাণী নয়

প্রাণবান, জীব নয় যুবা। দুই হাতে বিলিয়ে দেবার মতো ঐশ্বর্য্য, দুই ধারে ছড়িয়ে দেবার মতো বীর্য্য, দশদিক আলো করবার মতো আভা, এরি জন্তে তার ভাবনা; এ ভাবনা অভাবাত্মক নয়, ভাবাত্মক। সে চায় ঘনীভূত জীবন, আরো আরো আরো প্রাণ। সে চায় প্রাচুর্য্যান্বিত বৈচিত্র্যান্বিত সাহসান্বিত জীবন, যার অপর নাম যৌবন। সে চায় অজরত্ব, নিছক অমরত্ব তার কাছে তুচ্ছ।

পরের হাত থেকে অমনি সে কিছু নেয় না। সেই জন্তে পিতৃ-জনের দেওয়া জীবনটাকে হাজারো বার বিপন্ন করে সে আপনার করে নেয়, পিতৃগণের দেওয়া সত্যকে সে ভেঙে চুরে পুড়িয়ে গলিয়ে পুনর্স্ষ্টি করে। কিছুই তার কাছে অতি প্রাচীন বলে অতি পবিত্র নয়, লক্ষবার পরীক্ষিত সত্যকেও সে লক্ষবার পরীক্ষা না করে মানে না, বিনা যুদ্ধে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ প্রতীতি দেয না। প্রতিভার ক্ষুধায় সে যেখানে যা পায় তাই কাজে লাগায় আর সৃষ্টির সুধায় তাকে অনির্ব্বচনীয় রূপ দেয়। প্রেমের বাহু বাড়িয়ে সে আকাশের চাঁদ পেড়ে আনে আর হৃদয়ের শক্ত মুঠায় তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে ছিনিয়ে রাখ্তে থাকে।

তবু আসক্তিতে তার সুখ নেই। একদিন যা প্রাণভরে কামনা করে, অন্যদিন তা হাতে পেয়েও রাখে না। হারাতে হারাতে কি যায় কি থাকে সে দিকে তার খেয়াল নেই, তার খেলা খেল্না-ভোলার খেলা, খেলা যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই তার তপস্যা। নিজের জন্তে সে চরম সৌভাগ্যকেও চরম মনে করে না, দেশের জন্তে সে উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎকেও যথেষ্ট উজ্জ্বল জ্ঞান করে না, জগতের জন্য সে যে আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে সে আনন্দের সংজ্ঞা হয় না। ক্রমাগত সীমা ছাড়িয়ে চলাই তার দেহ মনের ধর্ম্ম, কোনো

কিছুকে আঁকড়ে ধর্‌লেই তার মনে মর্‌চে ধরে, দেহে কুঁড়েমি বাসা বাঁধে। কতদূর যে তার অধিকার কত প্রশস্ত তার পরিধি আগে হতে কেউ তা ঠিক্ করে রাখেনি, নির্ভুল ভাবে কোনো গুরুই তা ঠিক্ করে দিতে পারে না। নিজেকে কেবলি বিস্তীর্ণ, কেবলি বিচিত্র কর্‌তে কর্‌তে তার কত জনের সঙ্গে কত প্রথার সঙ্গে বিরোধ বাধে, সন্ধি হয় পুনরায় বিরোধ বাধে, মরার আগে শেষ মীমাংসা হয় না, মরার পরেও শেষ মীমাংসা নেই।

এহেন যে যুবা তার প্রতি বৃদ্ধের সহানুভূতি অসম্ভব। একের সমস্যা অপরের অবোধ্য। বৃদ্ধ কখনও ধারণা কর্‌তে পারে না যুবা কী চায়, বিশ্বাস কর্‌তে পারে না সে চাওয়া ভালো, স্বীকার কর্‌তে পারে না সে চাওয়া সত্য। বৃদ্ধ এসে সীমায় ঠেকেছে, তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চলৎশক্তি আড়ষ্ট, কল্পনাশক্তি ক্লান্ত, কেবল আতঙ্ক বোধ তীব্র। ভালো মনে কিন্তু ভীতু মনে কখনো তার পায় শিকল পরিয়ে কখনো তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কখনো তার মনে সংস্কার প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধ যুবাকে বাধাই দিতে ব্যগ্র, অনুগত কর্‌তে ব্যস্ত, মনোমত কর্‌তে উৎকন্ঠিত। পাঠশালায় বৃদ্ধই শিক্ষা দেয়, যুবা শিক্ষা পায়, সমাজে বৃদ্ধই শাসন করে যুবা শাসিত হয়। শিক্ষা ও শাসন ধাতুগত ভাবে একই; তাকে ভালোবেসে নিতে হয় না, মেনে নিতে হয়; তার মধ্যে এক পক্ষের আত্মসম্মানের চেয়ে অপর পক্ষের আত্ম-প্রেষ্টিজ বেশী। Superiority Complexএ গর্ব্বান্ধ হয়ে অবশেষে আর্টকেও শিক্ষার বাহন শাসনের যন্ত্র বানাতে চায় ইস্কুল মাষ্টার পাহারাওয়ালার দল। প্রতিভাকে ভারাক্রান্ত ও প্রেমকে পাশবদ্ধ করে তাদের শঙ্কা কমেনি, সৃষ্টিতেও তারা ফরমাস্ খাটাবে, মানবাত্মাকে তার শেষ আনন্দ থেকে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত

আত্মপ্রকাশ থেকে, আর্ট for art's sake থেকে নিরস্ত করবে, নিরুদ্দেশ্য লীলার উপরে আর্টে তাদের কৃপণ মনের উদ্দেশ্য চাপাবে। এই তাদের মনস্কামনা।

বৃদ্ধ হচ্ছে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ। ভূত তবু আপন জীবনটুকুর ভূত, পরের জীবনটুকুর উপরে তার লোভ। বৃদ্ধ কিন্তু আপন যৌবনটার ভূত, পরের যৌবনটার সঙ্গে তার বাদ। জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য বেশী। জীবনকে যে হরণ করে, সে সামান্যই হরণ করে, যৌবনকে যে হরণ করে সে সর্ব্বস্ব হরণ করে। কাঁচা চুলকে উপ্‌ড়ে দিলে বাজে কিন্তু বাধে না, কাঁচা চুলকে পাকিয়ে দিলে সর্ব্বনাশ। মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে দুর্গতি জরা। এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্ম-লক্ষণ। যৌবনের তপোভঙ্গের জন্যে জরা যে সব চর পাঠায় তারা শনির মতো কোন ছিদ্রে যে ভিতরে প্রবেশ করে আর ভিতর থেকে মেরুদণ্ডটিকে ক্ষয় করে আনে প্রথম থেকে তা বোঝা যায় না এবং অনেক পরে যখন বোঝা যায় তখনো আসল ব্যাধিটার চিকিৎসা না করে চিকিৎসা করা হয় আনুষঙ্গিক উপসর্গ গুলোর। এবং ভিতর থেকে বলাধান না করে বাইরে থেকে করা হয় উত্তেজক প্রয়োগ। ফলে হয় তো রোগী বাঁচে, কিন্তু সে বাঁচা রোগকে নিয়ে বাঁচা, একটার পর একটা উপসর্গকে নিয়ে চিকিৎসকের মুখ চেয়ে টিঁকে থাকা, দৈবের দেওয়া মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশায় কাঙালের মতো ধন্না দিয়ে পড়ে থাকা। এর মতো মরণ আর নেই, এ কেবল শ্বাসটুকু ছাড়া বাকী সমস্তটার পলে পলে মরণ।

———

ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ

এই জরাই হয়েছে আমাদের দুর্গতি। আমরা এত পুরাতন জাতি যে আমাদের বয়সের গাছ পাথর নেই, গাছপাথর খুঁজতে হলে মহেঞ্জোদারোর মরুভূমি খুঁড়্‌তে হয়। আমরা যে এতকাল টিঁকে আছি এইটেই এত বড় একটা অষ্টম আশ্চর্য্য যে, এই দর্পে আমরা ভুলে বসে আছি গাছপাথরেরো অধম হয়ে টিকে থাকার দাম কত এবং মিশরের mummy-র মতো টিঁকে থাকার দরকারটা কি। প্রাচীন ভারত যদি তার ভরা ঐশ্বর্য্য নিয়ে কালসাগরে ডুব্‌তো তবে সেই ভরাডুবি এই শতচ্ছিন্ন নৌকাখানার শতকলঙ্কের চেয়ে শ্রেয় হতো। অকাল মরণে গ্লানি নেই, জীবন্ত মরণেই গ্লানি।

আমাদের এই দেড় সহস্র বৎসরের ইতিহাস কেবল আত্মরক্ষার ইতিহাস। আত্মরক্ষা বৃদ্ধের ধর্ম্ম, মুমূর্ষুর ধর্ম্ম। যুবার ধর্ম্ম দিগ্বিজয়। নিজেকে বাঁচাতে ব্যাপৃত থাকলে বাঁচ্‌বার সময় থাকে না, নিজেকে বাঁচিয়ে চল্লে চলাই হয় না। মরণ বাঁচন তুচ্ছ করে দশ দিকে দশ অশ্ব ছুটিয়ে দেওয়া, মাঝখানে সূর্য্যের মতো জ্বল্‌তে থাকা, এরি নাম বাঁচা, এরি নাম চলা। কিন্তু এই দেড় সহস্র বৎসর আমরা শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পুঁটুলী বেঁধে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছি, কাঁকড়ার মতো নিজের গর্ত্তে নিজেকে তলিয়ে দিয়েছি, আক্রমণের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াইনি, পাল্টা আক্রমণ করিনি, খেদিয়ে নিয়ে যাইনি, নিজের গণ্ডীকে ক্ষুদ্রতর না করে পরের গণ্ডীর আধখানা দখল করে নিইনি।

আমরা পর্ব্বত লঙ্ঘন করে রাজ্য জয় করিনি, সমুদ্র পেরিয়ে উপনিবেশ গড়িনি, দেশে দেশে আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত দেশ ছিল সেই দেশ যুঝে নিইনি, সব ঠাঁই আমাদের যে ন্যায়সঙ্গত ঘর ছিল, সেই ঘর খুঁজে নিইনি। পাছে আমাদের কেউ ছুঁয়ে ফেলে, পাছে আমাদের কষ্ট করে গঙ্গাস্নান কর্‌তে হয়, পাছে আমাদের সারাজীবনের তপস্যা অন্যের ছায়া লাগ্‌লেই ব্যর্থ হয়ে যায়, পাছে আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার পাকা ঘুঁটি পরের এক আঘাতে কেঁচে যায়, সেই ভয়ে আত্ম-অবিশ্বাসী আত্মঘাতী প্রচ্ছন্ন জড়বাদী আমরা দেড় সহস্র বৎসর কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি, নিজেদের অধিকারকে খর্ব্ব হতে খর্ব্বতর করে নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেঁটে ফেলেছি ও ধড়টাকে অপরের অনধিগম্য কর্‌তে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছি, অপরে ধর্ম্মনাশ কর্‌বে ভেবে রাজপুত রমণীর মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করাকে বলেছি আত্মরক্ষা, অপরকে নির্ব্বিবাদে বস্ত্র হরণ কর্‌তে দিয়ে নিঃসহায়া দ্রৌপদীর মতো প্রায় বিবস্ত্র হওয়াকে বলেছি সতীত্ব, অপরের প্রতি অহিংস থাক্‌বার অটল সংকল্পে নিজেদের প্রতি হিংসার ইয়ত্তা রাখিনি, নিজেদের দেহের প্রতি নিগ্রহ নিজেদের স্বভাবের প্রতি repression, নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতি তাড়না এই হয়েছে আমাদের মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি এবং গ্রহণহীন বর্জ্জন, ভোগহীন ত্যাগ, আনন্দহীন কৃচ্ছ্রসাধনা—এই হয়েছে আমাদের আত্মহিংসার আদর্শ।

তবু এও তুচ্ছ, এ তবু বাইরের দুর্গতি। এর তলে তলে রয়েছে আমাদের দুর্গতির প্রতি আসক্তি, জরার প্রতি শ্রদ্ধা, পাকাচুলের অতুল প্রতিপত্তি, সে যাই বলে তাই গ্রাহ্য, সে যাতে

সুখ পায় তাই কর্ত্তব্য, সে শ্রদ্ধার যোগ্য নাই হোক তবু তার পায়ের ধূলো মাথায় নেওয়া চাইই। জরার প্রতি এই অহেতুক শ্রদ্ধাতে আমাদের জরার চেয়েও মেরেছে। ইচ্ছা করলেই আমরা এক লাফে সেরে উঠতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাটাকে পর্য্যন্ত আমরা বেহাত করে পাকাচুলের কাছে চিরনাবালক সেজেছি। না জানি কত শত বৎসরের জরা যার ব্যাধি এবং ব্যাধির চেয়ে ব্যাধির প্রতি আসক্তি যার শত্রু তার গায় সমাজ সংস্কারের ইঞ্জেক্‌শানই দাও আর রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্রোপচারই করো পৃথিবীর জোয়ান জাতিগুলোর সঙ্গে সব বিষয়ে পাল্লা দিয়ে চলবার সামর্থ্য কি তার হবে? বীর্য্য কি কখনো বাইরে থেকে আসে? বড় জোর তাকে আরো ক' হাজার বৎসর বাঁচিয়ে রাখতে পারো এবং গর্ব্ব করতে পারো যে জোয়ান জাতিগুলো জরতে না পেরে গ্রীস্ রোমের মতো মরেছে, কিন্তু এ জাত জরেছে তবু মরেনি। কী গৌরব! নাতিগুলো গেছে মরে, ঠাকুমা আছেন সশরীরে!

কিন্তু আমাদের এই ঠাকুমা-তন্ত্র রাজ্যে টিকে থাকা যদি বা সহ্য হয়, টিকে থাকার গ্লানি যে অসহ্য! পুরুষের পক্ষে পিতৃনামা হওয়ার মতো গ্লানি আর নেই, এ যে তারো অধম, এ যে ঠাকুমা-নামা হওয়া! স্বনামা হবার স্বাধীনতায় পদে পদে বাধা, পদে পদে নিষেধ, পদে পদে সন্দেহ। জন্মমাত্রেই আশীর্ব্বাদ, "অমুকের মতো হও"। জ্ঞান হলেই আদেশ, "অমুকের মতো হও।" বয়স হলে উপদেশ, "অমুকের মতো হও।" এই অমুকেরা তবু দু' এক পুরুষ আগের নন্, এঁরা 'সনাতন আদর্শ'! অতীতের ঘানি গাছের চারদিকে কলুর বলদের মতো একটা জাতি কেবল পাকই দিচ্ছে, পাকই দিচ্ছে, পাকই দিচ্ছে। একবারো ভাবতে চাইছে না,

পাক দেবো কেন ? পরের ছাঁচে নিজেকে ঢাল্‌বো কেন ? সীতা সাবিত্রীকে নকল কর্‌বো কেন ? শাস্ত্র থেকে নজীর দেখাবো কেন ? আমাদের আদর্শ আমরাই, আমাদের নজীর আমাদের শুভবুদ্ধি, আমাদের কৈফিয়ৎ আমাদের মানবসুলভ ভুলভ্রান্তি।

আমাদের দাস-মানসিকতার জড় আর কোথাও নয় এইখানে। মানুষের যেটা সকলের বড়ো অধিকার—ভুল কর্‌বার অধিকার—সেই অধিকারটাকে আমরা পাকাচুলের শ্রীচরণকমলেষু গছিয়ে দিতে শিখেছি। আমাদের ভাবনা তাঁরা ভেবে রাখ্‌বেন, আমাদের কাজ তাঁরা করে দেবেন, আমাদের ভালোবাসা তাঁরা ঘটিয়ে তুল্‌বেন। আমরা অর্ব্বাচীন, আমরা কি বুঝি আমাদের ভালোমন্দ ? তাঁরা প্রবীণ, তাঁরা আমাদেরকে আমাদের চেয়েও ভালো বোঝেন। তাঁরা যা করেন তাতেই আমাদের মঙ্গল, আমরা যা করি তাতে কেবল বিশৃঙ্খলা, কেবল বিপৎপাত, কেবল অশান্তি। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ঠাকুমার আঁচল ধরে হাঁট্‌তে শেখা, ঠাকুমার চশ্‌মা পরে জগৎটাকে চেনা! তারপরে আমরা যখন ঠাকুমার বয়সী হবো তখন আমরাও অভ্রান্ত হবো, যথের মতন সমাজের উপরে পাহারা দেবার যোগ্য হবো, নাতিগুলোকে পিটিয়ে পাহারাওয়ালা বানাবো।

দাস-মানসিকতার এই যে হাতে খড়ি এ আমাদের পরের ইস্কুলে হয় না, হয় ঘরের লোকের কোলে কাঁখে। দু' দশ ঘা বেতের চেয়ে দু' দশটা চুমুর জুলুম বেশী। ভালোবাসার অত্যাচার বড়ো নিগূঢ় অত্যাচার। ধমক দিয়ে কাজ করানো আর খোসামোদ করে কাজ করানো, রক্ত চক্ষুর হুকুম আর সজল চক্ষুর মিনতি, স্পষ্ট গলার ফরমাস আর নীরব মনের প্রত্যাশা, একই জিনিষের

এপিঠ-ওপিঠ। সে জিনিষটা আর কিছু নয় এই যে, গুরুজনের প্রতি আমাদের একটা জবাবদিহির দায় আছে, তাঁদের অমান্য করাটা একটা ছোটোখাটো রাজদ্রোহ, একটা petit treason! গুরুজনের তালিকাটি কিন্তু ছোটোখাটো নয়, সে তালিকায় নারীপক্ষে পতি দেবতাও আছেন। এবং শূদ্রপক্ষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ। আমাদের সমাজময় ধাপের পর ধাপ, প্রতি ধাপ উপরের ধাপকে খাজনা দেয়, নীচের ধাপ থেকে আদায় করে, আমাদের সমাজের আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রত্যেকেই এক একটি বৌ-কাট্‌কী শাশুড়ী ও নির্য্যাতিতা বধূ, একাধারে প্রভু ও দাস। কিন্তু নীচের ধাপটা আছে বলেই উপরের ধাপটা আছে, দাস না থাক্‌লে প্রভু থাকৃত না, শূদ্রেরি দোষ, বধূরি দোষ, কনিষ্ঠেরি দোষ, শিশুরি দোষ মুখ্য। তা বলে কিন্তু গুরুরা নির্দ্দোষ নন্‌ মোটেই।

নিজের পায় চল্‌তে লজ্জা বোধ ক'রে যে শিশু অতি হিতৈষী গুরুজনদের সনাতন কাঁধে চড়ে চলে সে শিশু যখন অন্যদের সঙ্গে বাজী রেখে দৌড়তে পারে না তখন দোষ ধরে অন্যদের। এতখানি চিনির ভিতরে এত তিক্ত কুইনিন গুপ্ত থাকে যে বেচারা শিশু তা টেরও পায় না এবং স্বভাব যাকে আপনি আরোগ্য কর্‌তো ঔষধের অভ্যাস তার ধাত বিগ্‌ড়ে দেয়, সে দোষ ধরে রোগের। রোগা ছেলের একে তো বারো মাসে তেরো অসুখ, সেই যথেষ্ট দুর্গতি। পরন্তু যদি অসুখের উপরেই তার সমস্ত মন পড়ে থাকে তবে সে হয় তারো বাড়া দুর্গতি। প্রতি দিনের জগৎটাকে সে বিস্ময়ের চোখে দেখ্‌তে পারে না, আনন্দের সুরে সাড়া দিতে পারে না, সৌন্দর্য্যের তুলি বুলিয়ে সুন্দরতর কর্‌তে পারে না। সর্ব্বক্ষণ কেবল "ম'লুম", "ম'লুম", "গেলুম", "গেলুম", আর অভিসম্পাত

আর আস্ফালন। ভুলেও একবার সন্ধান নেয় না কি অমিত বল তার আপন বাহুতে সুপ্ত, কি রসের উৎস তার আপন হৃদয়ে রুদ্ধ। একটুকু আত্মবিশ্বাস যদি তার থাক্‌তো তবে তার ব্যাধি তো সারতোই তার স্বাস্থ্য হতো সংক্রামক, তার স্বাস্থ্যে জগৎ হতো সুস্থতর। সেই আত্ম-বিশ্বাসটুকু নেই বলে সে হয়েছে ব্যাধির দাস আর দৈবের দাসানুদাস। কিন্তু যে অসামান্য যৌবনশক্তিতে মানুষকে দিগ্বিজয়ী করে তাকেই যে হেলা ভরে অবিশ্বাস কর্‌লে বিধাতারো সাধ্য নেই তার সখা হন্, বিধাতাও নিজের নিয়মে বাঁধা। বিধাতা তারি সারথি হয়ে সুখ পান যে রথীর ক্লৈব্য নেই।

যৌবনকে আমাদের দেশে অতি বিষম কাল বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে। সেই জন্য যৌবনাগমের পূর্ব্ব হতেই যৌবনকে সায়েস্তা রাখ্‌বার জন্যে আমাদের স্থবিরতন্ত্র সমাজ দুটি উপায় করেছে। একটি, জাতি প্রথা। অন্যটি, বাল্য বিবাহ। জাতি প্রথার উদ্দেশ্য ছিল পিতার পেশা পুত্র পাবে। বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পিতার নির্ব্বন্ধে পুত্র বিবাহ কর্‌বে। ইদানীং অবশ্য পিতার পেশার বদলে হয়েছে পিতার বাঞ্ছিত পেশা আর পিতার নির্ব্বন্ধের বদলে হয়েছে পিতার বাঞ্ছিত বিবাহ। কিন্তু ঘুরে ফিরে দাঁড়ায় ঐ একই— পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এ দু'টি ব্যবস্থার ফলে সমাজের আপাত সুবিধা কি হয়েছে, আমাদের কালো কালীর ইতিহাসে লেখা, কিন্তু এ দু'টি আমাদের যৌবনের গোড়ায় গিয়ে বেজেছে। যৌবনের একেবারে গোড়া-কার কথা, প্রতিভা ও প্রেম। নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত কর্‌বার যে শক্তি তার নাম প্রতিভা। আর অপরের প্রতিভার

সহিত সংযুক্ত হয়ে ফলবান হবার যে প্রেরণা তার নাম প্রেম। বয়স না হতেই যৌবনের এই দু'টি পায় যদি চৈনিক ধরণের দু'টি লোহার জুতো পরিয়ে দেওয়া যায় তবে সমাজরক্ষীদের আর ভাবনা থাকে না, তারা সেই আয়ার মতো নিশ্চিন্ত হয় যে আয়া শিশুকে আফিং খাইয়ে বেহুঁশ করে আপনি ঝিমোয়। দুরন্তপনার পরিসর হারিয়ে শিশুটা যদি বা গুড্ কণ্ডাক্ট প্রাইজ্ পাবার যোগ্য হয় তবু মানুষের মতো মানুষ হবার পরিসরকেও হারায়। খালি পায়ের দল যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলে যায় তখন সে টাল সাম্‌লাতে না পেরে মাটীতে গড়িয়ে পড়ে। এই ঠুঁটো জগন্নাথের পক্ষে সেকালের ভারতবর্ষ ছিল মন্দিরের বেদীর মতো নিভৃত, অতএব নিরাপদ। কিন্তু একালের ভারতবর্ষের সে প্রাচীর ভেঙে গেছে, জগন্নাথ জীউকে মাটীতে নাম্‌তে হয়েছে, পৃথিবীর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁকে ঠেলা দিয়ে মাড়িয়ে যাবার লোক একটি নয় অসংখ্য, এখন তাঁকে বাঁচায় কিসে? দেড় সহস্র বৎসরের লোহার জুতো এতদিনে পায়ের সঙ্গে মিশে গেছে, জরার বীজাণু রক্তের সঙ্গে সঙ্গে শিরায় শিরায় ঘুর্‌ছে, ভয় দখল করেছে হৃৎপিণ্ডের নির্জ্জনতম দুর্গ!

প্রতিভার উদ্বোধনে পুরুষকারের উদ্বোধন। প্রতিভার উৎসমুখে পৈত্রিক বৃত্তির জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে দিনে দিনে যে মানুষের পুরুষকারকে পক্ষাহত করা হোলো সে মানুষ কেবল মৌমাছির মতো নিখুঁৎ একটি চাক বাঁধ্‌তেই জান্‌লে; না জান্‌লে বৈচিত্র্য না জান্‌লে বৃদ্ধি; না উদ্ভাবন না পরিবর্ত্তন। অন্যেরা যখন উদ্যোগিতার দ্বারা এরোপ্লেনে উড়্‌লো তখনো সে গরুর গাড়ীতে চড়ে। কেন তার এ দশা? কারণ শৈশব থেকে তাকে এমন করে আফিং

খাওয়ানো হয়েছে যে সে তার সকল উদ্যোগের মূল মনটাকে ওড়াতে পারে না, ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির পরে ভর দিয়ে হাঁটায়। নিজের গড়া কল কারখানায় অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেক লোকসান দিতে হয়, অনেক তার হাঙ্গামা, একটা দিনো নিশ্চিন্ত হবার যো নেই, প্রবল প্রতিযোগিতায় সমস্তক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত থাকতে হয়। অত গোলমালে যায় কে? জগতের প্রতি দেশে প্রতিনিয়ত সমস্যা লেগে রয়েচে। যতই তারা একটার পর একটা সমস্যা অতিক্রম করছে ততই একটা না একটা নূতন সমস্যা তাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়াচ্ছে। তবু তারা এমনি রুখে চলেছে যে তাদের সাম্‌নে দাঁড়ায় কার সাধ্য? সমস্যাই পথ ছেড়ে দেয় পুরুষকারকে কিন্তু পুরুষকার যার গোড়া থেকেই আড়ষ্ট তার এত্তা জঞ্জাল!

প্রেমের উদ্বোধনে পৌরুষের উদ্বোধন। প্রেমের চাঁপা না ফুট্‌তেই কীটের ভয়ে তার কোরকটিকে যারা ফুলদানীর ভিতরে রেখে নির্ভয়ে ফোটাতে চাইলে তারা পৌরুষকে ছেড়ে ক্লৈব্যকেই বরণ করলে; তাদের কৃত্রিম চাঁপাতে উগ্রতা রইলো না বটে কিন্তু তেজও রইল না। চাষের কাজে লাগাবার জন্য যখন গরুকে বলদ বানানো হয় তখন চাষের সুবিধা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু যে গরুটাকে নির্ব্বীর্য্য করা হয় তার দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলে না। "ভারতবর্ষীয়" বিবাহই ভারতবর্ষের পুরুষকে হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দিয়ে কাপুরুষ বানিয়েছে। এ বিবাহে পিতৃজনের জাত-কুল-পদমর্য্যাদা তো বাঁচ্‌লো, কিন্তু সন্তানের হৃদয়কে যে ওড়্‌বার আকাশ দেওয়া হোলো না, খাঁচায় বাস করতে বাধ্য হয়ে যে সে নীড়ের স্বাদ পেলে না, সেই দুঃখে যে সে বৈরাগী হয়ে বনে বেরিয়ে গেলো। সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত্তি থেকে বঞ্চিত করে যাকে

সৃষ্টির হুকুম করা হোলো সে বেঁকে বসে বল্লে, "গৃহের তপস্যায় আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেই, দেখি যদি বনের তপস্যায় তা মেলে।" এমনি করে ভারতবর্ষের পৌরুষ প্রকৃতিকে ছেড়ে বিকৃতিকে ভাব্‌লে মার্গ, হরধনুকে ছেড়ে লোটাকম্বলকে কর্‌লে সম্বল, যে নারীকে অর্জ্জন কর্‌বার সুযোগ পায়নি সে নারীকে বর্জ্জন করাটাকে বল্লে সন্ন্যাস, যে সংসারকে সুন্দর কর্‌বার প্রেরণা পায়নি সে সংসারকে শ্মশান করাটাকে বল্লে মুক্তি।

গোড়া কাট্‌বার পরও আগায় কিছুকাল ফুল ফোটে, তাই এতদিন চলে এসেছে বলে আমরা ধরে নিয়েছি এইটেই নিয়ম। ঘরে বাইরে যখন দুর্গতির অবধি নেই তখনো আমাদের দৃষ্টি পড়্‌ছে কেবল শাখার দিকেই, মূলের কথা আমরা ভুলেই রয়েছি। কিন্তু সংস্কার তুচ্ছ বিপ্লব তুচ্ছ, আগায় জল সেচন করে মূলে রস জোগানো যায় না, মূল থেকে রস না পৌছলে শাখায় ফুল ফুটতে থাকে না, ফলগুলো বেঁটে খাটো হতে হতে কবে একদিন কুঁড়িতে মরে যায়। ভবিষ্যৎ মানে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর, ভারতবর্ষ যদি বা টিঁকে রয় তবু উঠ্‌তি দেশগুলোর মতেই ষড়ৈশ্বর্য্যময় হবে তো? সৃষ্টির পুষ্পিত ঐশ্বর্য্যের জন্যে চাই মজ্জাগত স্বাধীনতা-রস, প্রতিভার স্বাধীনতা, প্রেমের স্বাধীনতা। প্রতিভাকে ও প্রেমকে আমাদের জরা-নীয়মান সমাজ নখদন্তহীন জরদ্গব বানিয়ে নিজেই ঠকে গেছে, সেই জন্য সে সমাজ এমন নিরানন্দ, এমন অচরিতার্থ, এমন বন্ধ্যা। সে জানেও না অপরাপর সমাজের তুলনায় কত দীনহীন তার দশা।

সৃষ্টির স্বাধীনতাই মানুষের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডটাকে যদি মুরুব্বিয়ানা করে শৈশব থেকে বেঁকিয়ে দেওয়া যায় তবে মাথাটা আপনি নুঁয়ে আসে, আগে গুরুজনদের পায়ের তলে, তারপরে

বিশ্বজনের পায়ের তলে। সুবোধ বালকে ও সত্তা সতীতে সমাজ ভরে যায়, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ 'লাখে না মিলিবে এক।' হাজার হাজার বৎসর আমাদের সুপুত্রের ও সুপত্নীর দল অপরের অবাধ্য হওয়াটাকে পরম অধর্ম্ম ও নিজের উপরে আস্থাবান হওয়াটাকে বিষম ভয়াবহ জ্ঞান করে এসেছেন। স্বাধীনতার চর্চ্চাই আমাদের সমাজে নেই, স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত অবিশ্বাস করি, আমরা হাড়ে হাড়ে কর্ত্তাভজা। স্বাধীনতার জন্য পরের তৈরি রাষ্ট্রে আমরা লম্ফঝম্প করি কিন্তু ঘরের তৈরী সমাজে যে যার গদীতে গদীয়ান, তখন পণ্ডিতের ছেলের জন্য মাকড়ের অর্থ হয় ধোকড়, স্বাধীনতার ব্যাখ্যা হয় স্বৈরাচার। অত্যন্ত অভ্রান্ত গড্ডলিকাই যে সমাজের ইষ্ট স্বনিষ্ঠ পুরুষের তিলেক ভুলভ্রান্তিও সে সমাজের চোখে তার প্রমাণ উচ্ছৃঙ্খলতা।

স্বাধীনতার স্বয়ং সংশোধিকা শক্তিতে যে আমাদের বিশ্বাস নেই তার একটা আধুনিকতম নমুনা আমাদের অত্যাধুনিক সাহিত্যের নির্জ্জলা নিন্দা। সে সাহিত্যে বাড়াবাড়ি কিছু আছে, যৌবনের লক্ষণই হচ্ছে বাড়াবাড়ি। অন্য কোনো দেশ হলে এজন্যে কারুর মাথাব্যথা পড়্তো না, প্রবহমান সাহিত্যের যা থাকে একদিন ফেনা তাই হয় একদিন তলানি। তাকে নাড়াচাড়া কর্‌লেই বরং তাকে উপরে রাখা হয়।

সৃষ্টির দিশা

আমাদের একাধিক এক সহস্র সমস্যার কেন্দ্রগত সমস্যা তো এই। আমাদের যৌবন-প্রবাহ এত মন্থর যে প্রায় বন্ধ। সেই জন্যে যেটুকু আবিলতা ভরা গঙ্গাকে বৈচিত্র্য দেয় সেটুকু আবিলতা গঙ্গাজলের বোতলটাকে দূষিত করছে। অতি প্রাচীন সাহিত্যে যখন সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে অহল্যা দ্রৌপদীও ঠাঁই পেয়েছিলেন সে সাহিত্যে তখন আদর্শ বৈচিত্র্য কেন আদর্শ বিরোধও ছিল। সত্যি-কার আর্ট সম্বন্ধে নীতি দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না, সে সম্বন্ধে একমাত্র প্রশ্ন সে আর্ট কি না। গঙ্গা নদীতে পাঁক আছে না পদ্ম আছে এ প্রশ্ন অবান্তর, আসল কথা ওটা নদী কি না। ওটা যদি distilled waterএর কাঁচে-ঘেরা চৌবাচ্চা হয় তবে ওতে স্নান করে শুচি হওয়াও চলবে না, ওতে সাঁতার দিয়ে ওর বেগ সর্বাঙ্গে অনুভব করাও চলবে না, ওর স্বাদ নিয়ে তৃপ্ত হওয়াও অসম্ভব হবে। কেবল ওর চার দিকে পাহারা দিয়ে ফেরা ছাড়া অন্য কোনো চরিতার্থতা থাকবে না। বলা বাহুল্য-কোটালের চরিতার্থতা কোটালের পক্ষে যতই উপাদেয় হোক তস্করবহুল রাজ্যেও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা লক্ষবিধ চরিতার্থতা চায়, তাদের ঘরে পাছে কেউ আগুন লাগায় এই ভয়ে তারা ঘরে বসে থাকবে না, বাইরেকে তাদের বড়ো দরকার।

যে সমুদ্রে অমৃত থাকে সেই সমুদ্রে গরলও থাকে। সে জন্যে দেবতারা একটুও চিন্তিত হয় না; তাদের মধ্যে এমন প্রাণবান

পুরুষের অভাব হয় না যিনি গরলটাকে কণ্ঠে ধারণ করতে প্রস্তুত। তেমন পুরুষ না থাকলে ভাবনার কারণ ঘট্‌ত সন্দেহ নেই। তখন গরলের ভয় অমৃতের আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখ্‌তো। নিরাপদ পন্থীরা পরামর্শ দিতেন, "অমৃতে কাজ কি বাপু? যেমন আছি তেমনি থাকা শ্রেয়।" কিন্তু তেমন থাকাটা যে ভয়ে ভয়ে থাকা, ভয় যে মরণেরো অধিক, কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌?

জরাগ্রস্ত অস্তিত্বের মহৎ ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারে একমাত্র—যৌবন-ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম যদি স্বল্পমাত্রও হয় তবু সে অমৃত, সে অজর করে। তার আস্বাদ যদি পাই তো ঔষধ পথ্য মুখে রুচ্‌বে না, মাদুলী কবচ ছুঁড়ে ফেলে দেবো, ডাক্তার কবিরাজকে দূর থেকে নমস্কার জানাবো। ভিতর থেকে আমরা এত আনন্দ পাবো যে সেই আনন্দে আমাদের ব্যাধি তো যাবে সেরে, আমরা আনন্দ বিচ্ছুরিত করবো, জগৎকে আনন্দময় করবো। আমরা কৃপণের মতো আপনাতে নিবদ্ধ থাক্‌বো না, আমরা বিশ্বসংসারের সঙ্গে যোগ দিয়ে সকলের ভার ভাগ করে নেবো। কঠোরতম তপস্যাকেই তো আমরা ভালোবাসি, সহজকে আমাদের একটুও ভালো লাগে না, সমস্ত জীবনটাই যদি একটা অসাধ্যসাধন না হয় তবে জীবনকে আমাদের কিসের দরকার? সুলভ সিদ্ধিকে ধিক্‌ থাক্‌, দুর্ল্লভ সিদ্ধিকেও আমরা চাইনে, সুসাধ্য নয় দুঃসাধ্য নয় অসাধ্যেরি উপরে আমাদের লোভ, সিদ্ধিমাত্রেই আমাদের অলভ্য। যে পথের শেষ আছে সে পথ আমাদের নয়, আমরা তো লক্ষ্য মানিনে, আমরা মানি অক্লান্ত চলার আনন্দ। আমরা যুবা, যতক্ষণ আমরা দুঃখের আগুন নিয়ে খেলা করি ততক্ষণ আমরা সুখে থাকি, আরাম আমাদের উষ্ণ রক্তকে শীতল করে দেয়। যতক্ষণ জ্যোতি ততক্ষণ

জ্যোতিষ্ক, জ্বালা নিবে গেলে গ্রহ। তখন তার মাথায় দেখা দেয় পাকাচুলের মতো সাদা বরফ, সে বরফ তার একার নয় সমগ্র সৌরজগতের আতঙ্ক। সে তো আভাষিত করে না, কম্পান্বিত করে, নিজে তো জরেই সকলকে জরায়।

নিজেদের যৌবনের উপরে যদি অটল বিশ্বাস রাখি তো যৌবনই আমাদের পথ দেখাবে, সে আমাদের যে পথে নিয়ে যাবে সেই আমাদের পথ, স এব পন্থাঃ। আমাদের পথ আমাদের চল্‌বার আগে তৈরি হয়ে রয়নি যে পথ-নির্ম্মাতার সাহায্য না নিলে পথ হারাবো, যা তৈরি হয়ে রয়েছে তা পূর্ব্বপুরুষের পথ, সে পথ হারানোটাই ভাগ্য। সত্যের কোনো বাঁধা পথ নেই, যে পথ আমরা চল্‌তে চল্‌তে বাঁধি সেই আমাদের সত্যের পথ, পূর্ব্ব-যাত্রীদের পথের সঙ্গে তার কোথাও যোগ কোথাও বিয়োগ; যোগ দু'জন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ধরাধরি, বিয়োগ দু'জন স্বনিষ্ঠ পুরুষের হাত ছাড়াছাড়ি। পূর্ব্বপুরুষ উত্তরপুরুষকে দেয় আপন সত্যের স্মৃতি, উত্তর পুরুষ পূর্ব্ব পুরুষকে দেয় আপন সত্যের আভাস, কিন্তু সত্যকে কেউ কারুকে দিতে পারে না, সত্যকে আপনি উপলব্ধি করতে হয়। Self-education ছাড়া education নেই, educationএর নামে যা চল্‌ছে তা আমাদের ভাবতে দেওয়া নয়, আমাদের জন্যে ভেবে রাখা, আমাদের চল্‌তে দেওয়া নয় আমাদের চালানো। তার দ্বারা আমাদের উপকার হতে পারে, স্বপ্রকাশ হয় না। ইউরোপের আধুনিকতম ইস্কুলেরো উদ্দেশ্য শিশুকে গড়ে তোলা, মানুষ করা, তাকে একটা বিশেষ প্রভাবের মধ্যে বাড়্‌তে দেওয়া। কিন্তু প্রতিভা যে আগুনের মতো, উৎকৃষ্টতম ইস্কুলও তার পক্ষে কাঁচের ঝাড়ের মতো কৃত্রিম, সে যখন দিব্য তেজে জ্বলে

তখন কাঁচকে ফাটিয়ে খান্‌খান্‌ করে। যে মানুষ হয় সে আপনি মানুষ হয়, সে নিজেই নিজেকে গড়ে, সে সব প্রভাব অতিক্রম করে। যাকে মানুষ করা হয়, গড়ে তোলা হয়, স্পষ্ট প্রভাবিত করা হয় সে একটি পোষা বাঘের মতো স্বভাবভ্রষ্ট, সে একটা breeding farmএর ফসল, তাকে দিয়ে সমাজের শান্তিরক্ষা হয়, কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা হয় না, সৃষ্টি যে কেবলি আঘাত খেয়ে কেবলি চেতনা লাভ, কেবলি অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎ, কেবলি প্রত্যাশিতের গাফিলি। যারা বলে ভাবী বংশধরদের আমরা উন্নত করবো তাদের শুভাকাঙ্ক্ষার তারিফ কর্‌তে হয়, কিন্তু তাদের সত্যিকার কর্ত্তব্য নিজেদেরি উন্নত করা। ভাবী বংশধরেরা নিজেদের ভার নিজেরা নিতে পার্‌বে এটুকু শ্রদ্ধা তাদের পরে থাক্‌। সত্যকে পথের শেষে পাবার নয় যে বয়সের যারা শেষ অবধি গেছে তারাই পেয়েছে। পথের শেষ নেই, বয়সের শেষ নেই, সত্যকে পদে পদে পাবার, দিনে দিনে পাবার। শিশুর কাছে শিশুর অভিজ্ঞতাই সত্য, যতদিন না সে বৃদ্ধ হয়েছে ততদিন তার পক্ষে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অকালবৃদ্ধতা।

কিন্তু শিশু যখন নিজের পায়ে চল্‌তে গিয়ে পড়ে তখন সেই পতন কি তার পক্ষে ভয়াবহ নয়? নিশ্চয়। কিন্তু ততোধিক ভয়াবহ হিতৈষীর কাঁধ। নিধনে আর কিছু না বাঁচুক স্বধর্ম্ম তো বাঁচে। ভ্রান্তি থেকে আর কিছু না পাওয়া যাক সত্যকে তো পাওয়া যায়। মানুষের ছ'টা রিপু ছাড়া আর একটা রিপু আছে, সপ্তম রিপু, সে রিপুর নাম ভয়। আশ্চর্য্য এই যে ছয় রিপুর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে অনুশাসনের অন্ত নেই, কোন আদিকাল থেকে আমরা এদেরি সঙ্গে বজ্র আঁটুনি এঁটে আস্‌ছি, অথচ এদের প্রত্যেকের

মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও সকলকে জড়িয়ে বিরাট যে ভয়রিপু তাকে আমরা কর্ত্তব্যের মধ্যে আনিনি।

আমরা ভীরু নই আমরা প্রেমিক, আমাদের যৌবনধর্ম্ম আমাদের অন্তরের ধন, আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। মুক্তি যদি ভয়ের থেকে মুক্তি না হয় তবে মুক্তি আমরা চাইনে, আমাদের একমাত্র মুক্তি জন্ম থেকে মুক্তি নয়, মৃত্যু থেকে মুক্তি নয়, ভয় থেকে মুক্তি—জরা থেকে মুক্তি। কামক্রোধাদি রিপু এর তুলনায় নগণ্য; ভয়কে যদি জয় করতে পারি তো তাদের পায়ে দলতে পারবো। ভয়ই তো সয়তান, স্রষ্টার শত্রু, সৃষ্টির পতনকামী, পাপের মন্ত্রদাতা। আমরা যৌবনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে ভয়ঞ্জয় হবো, আমরা দিগন্তগ্রাসী তামসিকতার মাঝখানে আলোক-নিষ্ঠ প্রদীপের মতো জলবো। অপরিমেয় শূন্যের মাঝখানে সূর্য্য যেমন যুগযুগান্তকাল জ্যোতি বিকীরণ করছে সে জ্যোতি কত সামান্য দূর পৌঁছায় মনেও আনছে না, চির সমস্যাময় দেশে আমরাও তেমনি চিরজীবনকাল আভা বিকীরণ করবো, সে আভায় কোন্ সমস্যা কতটুকু ঘুচলো হিসাব করবো না। সমস্যা প্রতিদেশে ও প্রতি যুগে আছে এবং সমস্যা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ একসহস্র-এক। সুদূরতম ভবিষ্যতেও এর অন্যথা হবার নয়। লক্ষবর্ষ পরেও এ পৃথিবী—যদি থাকে তো—এমনি সমস্যাময় থাকবে, সেকালের মানুষের সেকেলে মন একে এমনি অমনোমতো ভাববে, সেকালের আদর্শবাদীদের কাছে এর অপূর্ণতা এমনি অসহনীয় বোধ হবে। সমস্যা দূর করবার জন্যে মানুষ নয়, সমস্যাকে ছাড়িয়ে ওঠবার জন্যেই মানুষ। সমস্যাসত্বেও কী করে উঠতে পারি, কী হয়ে উঠতে পারি এই আমাদের ভাবনা। মনুষ্যকে

বেঁচে ফেলার চেষ্টা বৃথা, সমুদ্রের উপরে ভেসে চল্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে হবে।

সমস্যা আছে বলে ভাবিনে। ভাবি, সমস্যার দ্বারা যাতে অভিভূত না হই। দুঃখ আছে বলে দুঃখ নেই। দুঃখ, পাছে শেষ পর্য্যন্ত খাড়া না রই। বাইরের প্রতিকূলতাকে ভয় করিনে, ভয় করি আপন অন্তরের ভীরুতাকে। ভূতের ভয়ে মানুষ ভগবানকে ভক্তি করে, আপনার ভয়ে আমরা আপনাকেই ভক্তি করবো। আত্ম-অবিশ্বাস মানে আত্মঘাত। যৌবনের পদে পদে বিপদ, সারাটা পথ অনিশ্চিত। প্রতিদিন পরীক্ষা চিরকাল হতাশা। অপরিসীম কষ্টস্বীকার, অপরিসীম ধৈর্য্যধারণ, অপরিসীম উৎসাহ-রক্ষা। অবিশ্রাম গতিবেগ, অবিরাম পরিবর্ত্তন, অনাসক্ত ত্যাগভোগ। যৌবন যে সৃষ্টিকাল, সৃষ্টি যে চির প্রসব-বেদনা, সেই বেদনায় যাকে টান্‌লো তার কেন শান্তিস্বস্তির প্রত্যাশা? সেই বেদনাই তার সৌভাগ্য।

তার জন্যে দুঃখের শেষে সুখ নেই, কেন না দুঃখের শেষ নেই। মর্ত্ত্যের শেষে স্বর্গ নেই, কেন না মর্ত্ত্যের শেষ নেই। তপস্যার শেষে বর নেই, কেন না তপস্যার শেষ নেই। চল্‌তে চল্‌তে যখন যা আসে তাই তার সুখ, কাঁটায় কাদায় ধূলায় ভরা চলার পথই তার স্বর্গ আর চল্‌তে পারাটাই তার বর। যৌবনকে যে অন্তরে ধারণ কর্‌লে সেই তো ব্রহ্মচারী, তার ব্রহ্ম যৌবনময় ব্রহ্ম। তার সন্ন্যাস বড়ো কঠিন সন্ন্যাস, কেন না মোক্ষ তার নেই। যে বেদনায় সূর্য্যতারাকে অবিশ্রান্ত ঘোরাচ্ছে, সেই বেদনা তাকে অবিশ্রান্ত পথে চলায়, জীবন থেকে জীবনে নিয়ে চলে, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। নির্ব্বাণ? জ্যোতির্লোকের কি নির্ব্বাণ আছে? নিজেকে

নির্ব্বাপিত করে সে লোক থেকে যে দূরে সরে গেলো সেই বিগত-জ্যোতি চন্দ্রকেও ঘুরে মরতে হচ্ছে। সেই নির্ব্বাণ কি কারুর কাম্য? মুক্তি? যতদিন না জগতের কণামাত্র বস্তু সৃষ্টিচক্র থেকে মুক্তি পায় ততদিন মহামানবেরো মুক্তি নেই, যে বাঁধনে পরমাণুকে বেঁধেছে সেই বাঁধনে তিনিও বদ্ধ। শেষ দিন কোনো দিন আস্‌বার নয়, সৃষ্টির শেষ নেই। নিজেরো শেষ খুঁজে পাবার নয়, শেষ পেয়েছি ভাব্‌লেও পাওয়াটা সত্য নয় ভাবনাটাই মিথ্যা। আত্মঘাতী যখন জীবনকে শেষ করেছি ভাবে তখনো সে বেঁচে। মরণ কেবল এক জীবন থেকে মুক্তি, আরেক জীবনে বাঁধা-পড়া। বিশ্বসংসার থেকে পালাবার পথ যখন নেই তখন মানব সংসার থেকে পালাবার প্রয়াস কেন? এ সংসারে যদি আনন্দ না থাকে তো কোন্ সংসারেই বা আছে?

নির্ব্বাণের তপস্যা আত্মহত্যার তপস্যা, মুক্তির তপস্যা পলায়নের। আমাদের তপস্যা সৃষ্টির তপস্যা, আমরা বিশ্বস্রষ্টার সহস্রষ্টা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য সাহচর্য্য। আমাদের পদে পদে মোহ-ভঙ্গ, তবু আমরা চির পদাতিক। আমাদের চোখে নিদ্রা থাক্‌বে না তবু আমরা খোলা চোখের স্বপ্ন দেখ্‌বো। আমাদের বাহু নেতিয়ে পড়্‌বে, তবু আমরা আনন্দলোক সৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌বো। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসের কতো দায়িত্ব! যে সৃষ্টি তার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে সে কি সামান্য সৃষ্টি! সে কি এত তুচ্ছ যে একটু আধটু জোড়াতালির সাপেক্ষ! দু'দশটা সংস্কার বিপ্লবের ব্যাপার! কঠিনতম বলেই তো তার দ্বারা পৌরুষের আত্মপরীক্ষা, প্রতিভার নব নবোন্মেষ, প্রেমের দেশব্যাপী প্লাবন। লক্ষ বর্ষ পরেও সাধের ভারতবর্ষ সৃষ্টি হতে থাক্‌বে, সৃষ্ট হয়ে উঠ্‌বে না, উত্তরোত্তর

পুরুষের পৌরুষকে প্রতিভাকে প্রেমকে এমনি সৃষ্টিতৎপর রাখ্‌বে, ছুটী দিয়ে বন্ধ্যা করবে না। আমাদের কয়েক সহস্র বর্ষের ইতিহাস তো ইতিহাসের ভূমিকা, এখনো আমাদের সকল হওয়াই বাকী, আমাদের হয়ে-ওঠা অনন্তকালে চল্‌বে। ভারতবর্ষের তরুণ তাপসকে প্রতিমুহূর্ত্ত সতর্ক থাকৃতে হবে, পাছে কখন মার এসে বলে "আমি ভানুমতীর ম্যাজিক জানি, চোখের সাম্‌নে ফল ফলিয়ে দেবো, আমার scheme সদ্যফলপ্রদ।" যা কিছু তপস্যাকে সরল সংক্ষিপ্ত করে দেয় তাই তপস্বীর প্রলোভন। তপস্যার অন্তক তপস্বীরো অন্তক। সফলতা যার কাম্য নয় তাকে ফল লোভ যে দেখায় সেই তো কাম, তাকে ভস্ম করতে হবে। ফল আপন সময়ে আপনি আসে, তার জন্যে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে ফুল ফোটানো ফেলে রাখ্‌বো না, ফুলের ঋতুতে ফুটে উঠে ফলের ঋতুতে ফল্‌বো। একটি ঋতুকে বাদ দিলে কোনোটিরি স্বাদ পাইনে। দশমাস গর্ভে না ধরে যাকে পাওয়া যায় তাকে পাওয়ার চেয়ে মৃতবৎসা হওয়া বরং আনন্দের। জীবনের কোনো অনুভূতিকেই পরবর্ত্তী অনুভূতির খাতিরে লাফ দিয়ে অতিক্রম করা চলে না, পরিপূর্ণ দাম্পত্যের পরে পরিপূর্ণ বাৎসল্য।

সংস্কার ও বিপ্লব বাইরের জিনিষ, সুস্থ সমাজে ওদুটো আপনা-আপনি হতে থাকে, সুস্থ দেহে যেমন ত্বক্ বদ্‌লায়। ওদের চেয়ে বড়ো কথা সমাজের স্বাস্থ্যবিধান, রক্তের জোর অটুট রাখা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অবিকল রাখা। এর জন্যে চাই অন্তরের উদ্বোধন, অন্তরের দিক থেকে বাইরেকে সৃজন। এ ক্রিয়া যখন পূর্ণ তেজে চলে তখন ভাত কাপড়ের ভার নিতে একটুও বাজে না, বরং সে ভার বইবার আনন্দ হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত। অন্তর যখন প্রাণোচ্ছল

হয় যখন দেহধারণের অসীম আনন্দ মানুষকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর পীড়া ভুলিয়ে দেয়, মানুষ কঠিন কিছু করতে পেলে বেঁচে যায়, সাধ্য সাধনা তাকে পীড়িত করে, হাতে হাতে ফল লাভ তার পক্ষে demoralisation—চরিত্রভ্রংশ। সেই জন্যে তরুণ-ভারতকে নিতে হবে অন্তরের দিক থেকে সৃষ্টি করবার ব্রত। বাইরের দিক থেকে বদলে যাওয়া তা হলে আপনা আপনি হতে থাকবে, দম দিলে ঘড়ির কাঁটা আপনা আপনি চলে, সারাক্ষণ হাতে ধরে চালিয়ে দিতে হয় না। আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকারী অন্তরের মধ্যে যৌবনকে অনুভব করা। দেহ মনের স্তর ভেদ করে আত্মা থেকে যৌবনরস উৎসারিত করতে হবে, যেমন মাটী পাথরের স্তর ভেদ করে artesian well থেকে জল উদ্ধার করা হয়। এই খনন কার্য্যের শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, শেষ নেই। সেই জন্যে এই কার্য্যই তরুণ ভারতের আত্মসম্মানের উপযুক্ত। এর চেয়ে সহজ কাজ তার পক্ষে অপমানকর। সে তো ফাঁকি দিতে চায় না, সে কাজই দিতে চায়। কিন্তু সে কাজ যদি কঠিনতম না হয় তবে তার পৌরুষ লজ্জা পায়, তার অন্তর সায় দেয় না, সে বেগার খাটতে খুঁৎ খুঁৎ করে ও প্রেরণার অভাবে বেকার বসে রয়। স্বতঃস্ফূর্ত্তির কাজ তো কেবল কাজ নয় সে খেলা। খেলার আনন্দ যখন কাজের আনন্দের সঙ্গে মিতালি পাতায় তখন বেদনার থেকে ভার চলে যায়, দুঃখের থেকে হুল্ চলে যায়, কাজও হয় অকাজের বহুগুণ। তখন একে একে দেশের সবই হয় এবং যা সকলের কল্পনারো অতীত তাও কেমন করে হয়ে উঠে আশ্চর্য্য করে দেয়।

ঘর ছেড়ে যদি বাহির হই তো আমরা জ্বলন্ত অভিসারে বাহির

হবো না, আমরা তারি অভিসারে বাহির হবো যাকে সর্ব্বস্ব দিয়েও কেউ কোনো দিন পায়নি ও পাবে না, আমরা চাই পূর্ণ পূর্ণতম অমৃতঘন চির কৈশোরকে। Rollandর এই মন্ত্রটি যেন আমাদের মন্ত্রণা দেয়—"Always to seek, always to strive NEVER to find, never to yield".

প্রচ্ছন্ন জড়বাদ

বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যখন যৌবন ছিল তখন সে যৌবন কোনো দিকে কোনো সীমান্ত মানে নি। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে শিল্পে ও বাণিজ্যে রাজ্য বিস্তারে ও ধর্ম্ম প্রচারে বামনদেবের পায়ের মতো স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল জুড়্‌তে গিয়ে সে নিরাপত্তিতে মেনে নেয়নি যে পূর্ব্ব হতে যেটুকু তার ছিল সেই পদতলগত ভূমিটুকুর বাইরে সে পা বাড়াতে পার্‌বে না। নিজের সীমা জান্‌বার জন্যে নদীকে বার বার কূল ছাপিয়ে পাড় ধ্বসিয়ে জনপদ দখল কর্‌তে হয়, তাতে যার লোকসান সে পারে তো পাথরের বাঁধ দিয়ে ঠেকাক্, না পারে তো ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চোখের জলে বুকের রক্ত লোকসান দিক্। কিন্তু নদী তো খাল নয় যে বাঁধের শাসন মেনে ঘোম্‌টা পরা বৌয়ের মতো জড়সড় হবে পা গুণে গুণে চল্‌বে। নদীকে দুকূল ভাসিয়ে দুকূল আবিষ্কার কর্‌তেই হবে, নইলে তার আপনাকে জানা হবে না। আত্মানং বিদ্ধি।

মানুষের ইতিহাসে যখন যে জাতির মধ্যে যৌবনের বন্যা নেমেছে তখনি সে জাতি দুই কূল ভাসিয়েছে। অন্তর্জ্জগৎ বা বহির্জ্জগৎ আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক দেহ বা মন কোনো একটা কূলের প্রতি তার একান্ত পক্ষপাত ঘটেনি। গ্রীস্ রোমের যখন যৌবন ছিল তখন তারা দুইদিকে সাম্রাজ্য জিনেছিল, মাটীর উপরে ও মনের ভিতরে। আধুনিক ইউরোপ আপন আত্মার গুহা থেকে যৌবনের তত্ত্ব উদ্ধার করেছে, তাই পৃথিবীর অর্দ্ধেক

ছাপিয়েও সে আপনার কূল পায়নি, মার্স্‌কে পর্য্যন্ত ছাপাবার অদম্য উদ্যমে লেগেছে। কিন্তু ইউরোপের বাইরের সাম্রাজ্য তো তার দুই কূল নয়, তার অন্তরের সাম্রাজ্যেও তার একটি কূল। সেদিকেও তার বিস্তারের সীমা নেই, ঐককেন্দ্রিক বৃত্তাবলীর মতো সে তার অন্তরের পরিধি বাড়িয়েই চলেছে, তার আর্ট তার বিজ্ঞান তার দর্শন—সবশুদ্ধ তার কাল্‌চার—প্রতিদিন খোলস ছেড়ে নূতন হয়ে উঠছে, প্রতিদিন যুগান্তর সৃষ্টি করছে। ইউরোপের যদি অন্তরের ঐশ্বর্য্য না থাক্‌তো তবে তার বাইরের ঐশ্বর্য্যও থাক্‌তো না। যে কারণে মানুষ অন্তরে ঈশ্বর হয়, সেই কারণেই মানুষ বাইরেও ঈশ্বর হয়। একই যৌবন দেহকে ও মনকে একবৃন্তে দুই ফুলের মতো ফোটায়।

ভারতবর্ষের যৌবনকালে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার বড়াই করেনি, আধিভৌতিকার জন্য লজ্জিত হয় নি। তার ভিক্ষুরা চীনে জাপানে গিয়ে ভারতবর্ষের প্রেমের সীমানা বাড়িয়েছেন, তার ভাগ্যান্বেষীরা জাভায় সুমাত্রায় গিয়ে ভারতবর্ষের বলের সীমানা বাড়িয়েছেন, তার বণিকেরা রোমে মিশরে গিয়ে ভারতবর্ষের ধনের সীমানা বাড়িয়েছেন। তার মনু ধর্ম্মশাস্ত্র সংকলন করেছেন, তার কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র সংকলন করেছেন, তার বাৎসায়ন কামশাস্ত্র সংকলন করেছেন। তার রাজারা প্রতি শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েছেন, তার ঋষিরা চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রমটাকেই সর্ব্বস্ব করেন নি। তার নারীরা স্বয়ম্বরা হয়েছেন, তার পুরুষেরা স্ত্রীরত্নের জন্য জাতকুল মানেননি। পরিপূর্ণতম যৌবনের বিচিত্রতম আত্মপ্রকাশ তখনকার সমাজকে বিশৃঙ্খল করেছে, কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলতার শতসহস্র ডালপালার মূলে রয়েছে যৌবনরসের ঐক্য।

যৌবনরসের যখন কমতি ঘটে তখন শত সহস্রকে ছেঁটে কেটে বিশপঁচিশটিতে পর্য্যবসিত করলেও পুষ্পিত রাখা যায় না। আর যৌবনরসের যখন বাড়তি ঘটে তখন শতসহস্রের স্থলে লক্ষকোটি হলেও ফুলে ফলে ভরে যায়। সুস্থ সমাজের পক্ষে বিশৃঙ্খলার প্রশ্নই ওঠে না, একমাত্র প্রশ্ন সে সমাজ সুস্থ কি না। আর রুগ্ন সমাজের পক্ষে সুশৃঙ্খলা কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়, মাথার চুল খাটো করলেও মাথাব্যথা থাকে। ভরা নদীতে পাঁক আছে কি না এ প্রশ্ন হাস্যকর, শুকনো চড়াতে যে পাঁক নেই এটা মজা নদীর পক্ষে বড়াই করবার কথা নয়।

ইউরোপে এতো দেশ এতো ভাষা এতো সম্প্রদায় এতো দল। মারামারি হানাহানি দলাদলির না আছে সংখ্যা না আছে সীমা। তবু ইউরোপের শিরাপ্রশিরায় তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য্য আছে যে প্রাচুর্য্য জাতি-বিরোধ সত্ত্বেও জার্ম্মানকে ইংরাজকে মতবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাথলিককে নাস্তিককে, স্বার্থবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাপিটালিষ্টকে কম্যুনিষ্টকে, দৃষ্টিবিরোধ সত্ত্বেও প্রবীণকে তরুণকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি জোগায়। বিরোধ যত বড়োই হোক বিরোধে যে শক্তির পরিচয় সে শক্তি তারো বড়ো। সেই জন্যে গত মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় রক্তক্ষয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাল্পতা ঘটলো না, গভীরতম ক্ষতের চিহ্ন মলিনতম হয়ে এলো এবং দেখতে দেখতে ইউরোপ নবকলেবর ধারণ করলে। যৌবন কতো প্রবল হলে এমনটি সম্ভব হয় তা আমরা কত শত বৎসর হতে ভুলেছি বলে ইউরোপকে বলি জড়বাদী। আর অধ্যাত্মবাদী নাকি আমরা যাদের অনটন শুধু অন্নবস্ত্রের হলে তো ভাবনা ছিলো না, অনটন একেবারে যৌবনের,যে যৌবন মানুষকে সাহসে সংকল্পে উদ্যোগিতায়

ঘরে স্থির থাক্‌তে দেয় না, বাইরে ঠেলে নিয়ে বিশ্বজয়ী করে দেয়, জ্ঞানে প্রেমে পরাক্রমে শুধু সচ্ছল করে না, উচ্ছল করে। হায়! আমাদের কি কেবল অন্নের দুর্ভিক্ষ! আমাদের দুর্ভিক্ষ যে অমৃতের! অমৃত থাক্‌লে অন্ন আপনি আসে, না থাক্‌লে যদি বা আসে তবে যেতে বিলম্ব করে না। তবু জড়বাদীর মত আমরা ভাব্‌ছি কোনোমতে যদি একবার আমরা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই তবে আমাদের আর ভাবনা নেই, আমরা আমাদের পিতৃ-পিতামহের মতো নিশ্চিন্তমনে হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে নশ্বর জড়পিণ্ডটা ত্যাগ করে শাশ্বত অমৃতলোকে প্রস্থান কর্‌তে পার্‌বো! কিন্তু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবার জন্যে যে কতো বড়ো আত্মার কতখানি উদ্বোধন দরকার ইউরোপকে দেখলে তা বুঝতে পারি।

দুঃখ ইউরোপেরো আছে, আমাদের চেয়ে বেশী বই কম নয়। মাটী জল হাওয়ার সঙ্গে মানুষের যেন হন্তা হন্যমান সম্পর্ক। শীতে বর্ষায় বরফে কুয়াসায় প্রাণ হাতে করে বাঁচ্‌তে হয়, একমুঠো অন্নের জন্যে কলা-কৌশলের এক মুহূর্ত্ত ক্ষান্তি নেই। তবু মানুষ এখানে চক্রবর্ত্তী সম্রাট্। সে যে কেবল পঞ্চভূতের ফণার উপর খড়ম রেখে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, সে বাঁশী বাজাচ্ছে। তার কোটী দুঃখের চেয়েও সে বড়ো, সে দুঃখের কোটীপতি, সে দুঃখ-কুবের। ইউরোপের জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, এ যেন বন্যার মতো জোরালো এবং ঘোরালো, এতে সর্ব্বক্ষণ নৌকাডুবি, সর্ব্বক্ষণ নৌচালনার গৌরব। ইউরোপ মানবজাতির মান রেখেছে। ইউরোপের মধ্যে মানুষ নিজের রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি দেখ্‌ছে, এই যেন প্রাচীন ভারতের সত্যিকার উত্তরাধিকারী। এতো বিশৃঙ্খলা বুঝি কোনো দেশের কোনো সমাজে নেই, ভালমন্দ সুন্দর কুৎসিৎ

শুচি অশুচি সব এক সঙ্গে একই বন্যায় নৌকা ভাসিয়েছে, এক একটি মানুষ যেন এক একটি type। এই যে মানুষ ফী ঘণ্টায় আকাশে ওড়ার রেকর্ড বাড়াতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, মোটর সাইকেলের গতিবেগ বাড়াতে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে, ব্যাধিবীজের স্বরূপ আবিষ্কার কর্‌তে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে—এ মরণ সুখের মরণ নয়, ডাবা হুঁকোটি হাতে করে শীতলপাটির উপরে দেহত্যাগ নয়, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সতী সাধ্বীর মতো স্বর্গযাত্রা নয়। মেয়েপুরুষ মিলে এই যে সহমরণ এ কখনো আকাশের শেষ খুঁজ্‌তে গিয়ে, কখনো পাতালের তল খুঁজ্‌তে গিয়ে, কখনো অকারণে কখনো কুকারণে। দারিদ্র্যেরো অবধি নেই—প্রতিদিন পুরানো যন্ত্রকে নাকচ্‌ করে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে, পুরোনো যন্ত্রীদের অন্ন যাচ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়্‌ছে বই কম্‌ছে না। পাপেরো পরিসীমা নেই, অতি অপর্য্যাপ্ত পাপ। তবু এতো লোকসান দিয়ে মানুষ নিজের বিচিত্ররূপ দেখছে, ফিরে যাবার নামও কম্‌ছে না।

সংসারে দুঃখ দ্বন্দ্ব বিশৃঙ্খলা চিরদিন ছিল, চিরদিন থাক্‌বে। সংসারোঽয়মিব অতীত বিচিত্রঃ। যে সব খণ্ডকে নিয়ে বিচিত্রের অখণ্ডতা তাদের কারুরি সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই, নিজের নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারা নিজের সীমা খুঁজ্‌তে যায়, পরস্পরকে আঘাত করেও পরস্পরের দ্বারা আহত হয়, পরস্পরকে আত্মসাৎ করে বা পরস্পরের আত্মসাৎ হয়। এই সীমা খুঁজ্‌বার দুনিবার আগ্রহে তথাকথিত জড় কেমন করে জীব হয়ে উঠ্‌লো, জীব কেমন করে যুবা হয়ে উঠ্‌ছে। তথাকথিত জড়ের দুঃখ যদি এতো, জীবের দুঃখ হবে কতো! আর জীবের দুঃখ যদি অসীম হয়, যুবার দুঃখ

তবে কী অপরিসীম। যার যতো চেতনা তার ততো বেদনা। সীমা জান্‌বার আগ্রহ যার যতো প্রগাঢ় বাধা সরাবার দায় তার ততো প্রচুর। যুবার বাধা কখনো বহিঃপ্রকৃতির দেওয়া, কখনো অন্তঃপ্রকৃতির দেওয়া, কখনো অপরের দেওয়া, কখনো আপনার দেওয়া। বাইরে-ভিতরে সমষ্টিতে-ব্যষ্টিতে মিলিয়ে বিরাট বিশ্বসংসারে কি বিরুদ্ধতার ইয়ত্তা আছে! পরমাণু থেকে পরমজ্ঞানী পর্য্যন্ত কেউ জানে না কত দূর কার সীমা, ভিড়ের মধ্যে সকলেই সকলকে ঠেলে, ধাক্কা খায়, ধাক্কা দেয়। তুমি যদি নিষ্ক্রিয়ও হও তবু ধাক্কাটি তো খাবে এবং খেয়ে অপরের ঘাড়ে তো পড়্‌বে। নিষ্ক্রিয়ই হও সক্রিয়ই হও দুঃখ পেতেই হবে, দিতেই হবে। যদি বলো, "কোনোটাই হবো না, একেবারে নির্ব্বাণ চাই, আদপেই থাক্‌বোনা" তবু নিস্তার নেই, তুমি ছাড়তে চাইলেও কম্‌লী নেই ছোড়তী, বিশ্ব তোমাকে ছাড়বে না, সামান্যতম কণাটুকুকে পর্য্যন্ত সে প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে ধর্‌বে। যা-কিছু আছে তার রূপ রূপান্তর আছে, কিন্তু তার নাস্তিত্ব নেই। শূন্যও শূন্য নয়। অনিত্যও সত্য।

টিঁকে থাক্‌তে হলে নিষ্ক্রিয় হলেও চলে, কিন্তু বাঁচ্‌তে হলে সক্রিয় হতে হয়। সে বাঁচা শতং সমাঃই হোক, আর একটি ঘণ্টাই হোক্। তথাকথিত জড় যথেষ্ট সক্রিয় ভাবে বাঁচে না, প্রকৃতির কোলে পুতুলটির মতো ঘুমায়, তাই তার ভিতরকার পুরুষ আড়ামোড়া দিলে, দিয়ে জীব হলো! জীবও সক্রিয় ভাবে বাচে না, প্রকৃতির দোল্‌নায় শিশুর মতো ঝিমায়, তাই তার ভিতরকার পুরুষ চোখ রগ্‌ড়ে লাফ দিয়ে উঠ্‌লো, উঠে যুবা হতে লাগলো। প্রকৃতির আওতা ছাড়িয়ে যতোই সে বাড়ে প্রকৃতি

ততোই তাকে কোলপোঁছা কর্‌তে প্রাণপণ করে। কিন্তু সে তো পুতুল নয়, শিশু নয়, সে যুবা পুরুষ। সে প্রকৃতির স্বামী, তার স্বামীত্বের মধ্যেই প্রকৃতি নিজের সেবিকাত্বের সার্থকতা পায়। তার কাছে হার মেনেই প্রকৃতির আনন্দ, সেই জন্যে প্রকৃতি তাকে হার মানাবেই বলে পণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে যতো দুঃখই দেয় কোনো দুঃখ তাকে নীচু কর্‌তে পারে না, দুঃখেরি উপরে পা রেখে সে উঁচু হয়ে ওঠে, মাথার বোঝাকে করে পায়ের আসন। বহিঃপ্রকৃতিকে ভোগে লাগিয়ে সে দেহ ধারণ করে, অন্তঃপ্রকৃতিকে যোগে লাগিয়ে সে মন ধারণ করে। সে মাটীকে দিয়ে ফসল ফলায়, আগুনকে দিয়ে রান্না করায়, জলকে দিয়ে নৌকা টানায়, আগুন জলকে বাষ্প করে যন্ত্র চালায়। সে কামকে করে তোলে প্রেম, ভয়কে করে তোলে ভক্তি, অহংকারকে করে তোলে আত্মজ্ঞান, ঈর্ষাকে করে তোলে উপচিকীর্ষা। তাকে অভিভূত কর্‌তে পারে এতো সাধ্য কারুর নেই, environmentকে বশ কর্‌তে কর্‌তেই সে বিবর্ত্তিত হলো, heredityকে কাটিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তেই সে উঠ্‌লো, না প্রকৃতি না পূর্ব্বপুরুষ কেউ তাকে সীমা নির্দ্দেশ কর্‌তে পার্‌লে না, অসীম দুঃখকে আত্মসাৎ করে সে অসীমতর আপনাকে জান্‌তে জান্‌তে চল্লো।

লক্ষ লক্ষ cellকে নিয়ে তার দেহ, লক্ষ লক্ষ প্রবৃত্তিকে নিয়ে তার মন, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে নিয়ে তার সমাজ। সবাই আপন আপন সীমা জান্‌বার জন্যে সীমা ছাড়াতে চায়, অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী, জটিলতা অনিবার্য্য। সাম্‌নে আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর, দিন দিন দুঃখ আরো দুঃসহ হতে থাক্‌বে, জটিলতার অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি

হারে এমন দুর্ব্বোধ্য হতে থাকবে যে কোনো একজন মানুষকে বোঝ্‌বার ক্ষমতা বা অবসর কোনো একজন মানুষের থাক্‌বে না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভবিষ্যৎ ভাবতে বস্‌লে কূলকিনারা মেলে না। প্রতি মানুষের গণপ্রকৃতিকে খর্ব্ব কর্‌তে কর্‌তে প্রতি মানুষের ব্যক্তি প্রকৃতি যতোই বৃহৎ হতে থাক্‌বে মানুষ মাত্রেরি দুঃখ ততোই সূক্ষ্ম হতে থাক্‌বে এবং একের সূক্ষ্ম দুঃখের সঙ্গে অপরের সূক্ষ্ম দুঃখের সহানুভূতি ততোই দুঃসাধ্য হতে থাক্‌বে। যে সব যুগকে আমরা পিছনে ফেলে এলুম সে সব যুগের দুঃখগুলো এর তুলনায় শিশুসুলভ। মানুষকে Socratesএর মতো প্রশান্তবদনে বিষপান করতে হবে, কাপুরুষের মতো পালিয়ে বেড়ালে চল্‌বে না। বিষকে যদি ফাঁকি দিই তবে অমৃত আমাদের ফাঁকি দেবে। অথচ বিষকে ফাঁকি দিলে যে মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পার্‌বো এমন ভরসাও নেই। বিশ লাখ বৎসর পরে এ পৃথিবীর তাপ নিবে যাবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি একে বাসযোগ্য না রাখ্‌তে পারি কিংবা গ্রহান্তরে না উড়ে যাই তবে ততদিনে পশু পাখী গাছপালার সঙ্গে আমরাও বরফ হয়ে থাক্‌বো। কতো শত প্রাণী নির্ব্বংশ হয়ে গেলো, মানুষ যে কোটী কোটী বৎসর থাক্‌বে এতোটা আশা করা যায় না; মার্স-ভিনাসে উপনিবেশ কর্‌বার পরেও একদিন নির্ব্বংশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কতো বিরাট কতো অসীম কেমন অনাদ্যন্ত এ জগৎ! এর ভিতরে যা-কিছু আছে তার রূপরূপান্তর আছে, কিন্তু নির্ব্বাণ কোথায়! মানুষ অন্যরূপে থাক্‌বেই, কিন্তু যতক্ষণ এইরূপে থাকে ততক্ষণ যেন সে এইরূপের মান রাখে, সীমা খোঁজে, দুঃখ সয়, বিচিত্র হয়!

ভারতবর্ষের মানুষ যেদিন সব মানুষের নেতা ছিল সেদিন সব মানুষের চেয়ে যুবাও ছিল। তার দুঃখের দিকটাও ছিল সেই অনুপাতে বিপুল। যুদ্ধ মহামারী দুর্ভিক্ষ যে তার অজানা ছিল এহেন সত্যযুগে সে ছিল না। এগুলো যদি নাও ছিল তবু ঋষিকে সত্যের ধ্যানে বীরকে মঙ্গলের প্রচেষ্টায় শিল্পীকে সৌন্দর্য্যের অভিসারে অক্লান্ত কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়েছিল; সে কষ্টের কোনো বাঁধা অভ্যাস ছিল না বলে সে ছিল ইতর সাধারণের সংসারকষ্টের চেয়ে নব নব আঘাত প্রতিঘাত-সঙ্কুল। তখনকার ভারতবর্ষের সেই বেদনার সৃষ্টিকে আমাদের গত দেড় সহস্র বৎসরের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাঙিয়ে খেয়েছেন, তাই নিয়ে তাঁদের যা-কিছু গর্ব্ব। তাঁরা নিজেরা যা সৃষ্টি করেছেন তা এতো সামান্য যে এক কালিদাসের কালে গুপ্তসাম্রাজ্যের লোক তার বেশী সৃষ্টি করেছিলেন। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যেন সূর্যবিরহিতা রাত্রির মতো অন্ধকারে ছিল, তারার মতো ঝিকৃমিক কর্‌ছিলেন কেবল চৈতন্য কবীর তানসেন তুলসীদাসেরা। গত এক শতাব্দীর পুনর্জাগরণের ঊষাকালেই আমাদের নিকট পূর্ব্ব-পুরুষেরা তার পূর্ব্বের দেড় সহস্র বৎসরকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন, কিন্তু আমরা মানুষের নেতা হতে পারিনি, আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বমানব তার সীমার সন্ধানী হয়নি, আমাদের ঘরোয়া তপস্যাটুকু সমগ্র মানব জাতির বৈচিত্র্যের তপস্যা নয়।

এর কারণ বহু শতাব্দীর সংস্কারবশত আমরা আত্মায় কৃপণ রয়েছি, আত্ম-অবিশ্বাসী না হই আত্মঅল্পবিশ্বাসী। এখনো আমরা আধ্যাত্মিকতার নাম করে নিজেদের অজ্ঞাতসারে জড়বাদ কপ্‌চাই। সেই জন্যে যন্ত্রের প্রতি আমাদের বিরাগ, দেহ সম্বন্ধে

আমাদের বৈরাগ্য, সমাজকে সরল কর্‌বার জন্তে আমাদের প্রয়াস, সমস্তাকে চিরকালের মতো মীমাংসা করে ফেল্‌তে আমাদের প্রবৃত্তি, দুঃখকে দূর কর্‌বার দিকে আমাদের অভিযান। জড়বাদ বল্‌তে আমি বুঝি, বাইরের দ্বারা অন্তরের নিয়ন্ত্রণ, আবেষ্টন কর্ত্তৃক আত্মার উপর প্রভাব, প্রকৃতির কাছে পুরুষের পরাভব। জড়বাদীরা ভাবেন বাহিরকে বদ্‌লালে অন্তর বদলাবে, অভাব দূর কর্‌লে স্বভাব নষ্ট হবে না, জটিলতা ছেঁটে ফেল্লে সারল্য ফিরে আস্‌বে। কিন্তু বাহিরকে বদ্‌লাতে হলে অন্তরেরি সাহায্য নিতে হয়। আর অন্তরেরি সাহায্য নিতে হয় যদি, তবে বাহিরকে কেনই না বদ্‌লাতে চাওয়া, বাহিরটা আপনিই বদলাক্ না! অন্তরকে কেন লীলা কর্‌তে ছেড়ে দাও না, কেন একটা উদ্দেশ্মের বেগার খাটাও? একটা উদাহরণ দিই। সাধুরা বলেন কামিনীকাঞ্চন পরিহার না কর্‌লে সাধনাই হয় না। অথচ পরিহার কর্‌তে গেলেই পরিহার করা শক্ত হয়, কেননা যাকে পরিহার কর্‌তে চাই সে পিছু নেয়। সারা জীবন এমনি চলে, শেষ পর্য্যন্ত ভয় ছাড়ে না। না-মন্ত্রের সাধনামাত্রেই এরকম। প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি না-মন্ত্রের দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন তিনি কি হাঁ-মন্ত্রের দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্‌তে পারেন না? অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ হতে পারেন না? না যদি পারেন তবে তাঁর অক্ষমতা থেকেই গেলো। আমাদের ছুঁৎমার্গী আচারনিষ্ঠদেরো সেই দশা—ঠুন্‌কো কাঁচের মতো একটু ছোঁয়া লাগ্‌লে চুর্‌মার।

আঁধার নিঃশেষ কর্‌বার প্রয়াস বৃথা, নিজে উজ্জল হয়ে সকলকে উজ্জল করো, দেয়ালী আমাবস্তার রাত্রে একটি দীপের শিখা সকল দীপে সঞ্চারিত হোক্। চাই জ্ঞানের আলো, প্রেমের আলো,

শক্তির আলো। দুঃখ এতে একটুও কম্‌বে না, মানুষকে সুখের আশা দিয়ে ভোলানো পাপ। কিন্তু দুঃখকে বহন কর্‌বার গৌরব বাড়্‌তেই থাক্‌বে, অসাধ্যসাধনের ব্যর্থতা বহন কর্‌তে শেখানো পুণ্য। মানুষকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা যেন তাকে উল্টো না বোঝেন, সে সুখ শান্তির কাঙাল নয়, সে চায় বিচিত্রতম উপলব্ধি। সে তো দুর্ব্বল নয়, যাঁরা তাকে দুর্ব্বল বলে বলে তাকে ভিতর থেকে দুর্ব্বল করে তোলেন তাঁরা তার দয়াময় শত্রু, যারা তাকে দ্বন্দ্বে ডাকে তারাই তার নিষ্ঠুর মিত্র। মানুষ তো দয়া চায় না, চায় শ্রদ্ধা। মানুষকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন তাঁরা তার দুঃখে এতোই ব্যথিত হন যে তার দুঃখ লাঘব কর্‌তে চান না, তাকে বজ্রকণ্ঠে ডেকে বলেন "I have not come to give you peace. I have come to give you the sword !" (যীশু)। তাঁরা বলেন, "নয় এ মালা নয় এ থালা গন্ধজলের ঝারি! এ যে ভীষণ তরবারি।" জ্ঞানের তরবারি, প্রেমের তরবারি, বীর্য্যের তরবারি। এই তরবারিই তো মানুষের গ্রহণযোগ্য, এর যোগ্য না হতে পার্‌লে মানুষকে শত ধিক্!

এক্‌লা চল্‌ রে

যে নাচ্‌তে জানে সে উঠানের দোষ ধরে না। উঠানটা যেমনি হোক্ নাচ্‌টাই আসল, নাচের অবহেলা করে একটাও মুহূর্ত্ত যদি উঠানকে দেওয়া যায় তবে নাচের তাল কেটে যায়। নাচের তাগিদটা এতো প্রবল যে নিখুঁৎ একটা উঠানের সন্ধানে বাহির হতে গেলে নাচের তর সয়না এবং যে উঠানে থাকা গেছে সেই-টাকেই ঝাঁট দিয়ে তারপরে তাতে নাচ্‌বার প্রস্তাবেও চরণ সায় দেয় না। সুতরাং উঠানের ভাবনা ছেড়ে নাচের ভাবনাই ভাবতে হয়, সমুদ্রের ভাবনা ছেড়ে নৌচালনার, অমাবস্যার ভাবনা ছেড়ে দীপের। নাচ্‌তে গিয়ে যদি উঠানটারো সম্মার্জ্জনা হয়ে যায় তো ভালোই, নইলে সম্মার্জ্জনা সম্বন্ধে নাচ্‌বার লোকের কোনো দায়িত্ব নেই।

যে বাঁচ্‌তে জানে সে সংসারের দোষ ধরে না। সংসারটা যেমনি হোক্ বাঁচাটাই আসল, বাঁচার অবহেলা করে একটাও মুহূর্ত্ত যদি সংসারকে দেওয়া যায় তবে বাঁচার ঠাসবুননে জাল দেখা দেয়। বাঁচার তাগিদটা এতো প্রবল যে নিখুঁৎ একটা পরলোকের বা পরজন্মের সন্ধানে বাহির হতে গেলে বাঁচার তর সয় না এবং যে সংসারে থাকা গেছে সেইটাকেই মনের মতো করে তারপরে তাতে বাঁচ্‌বার প্রস্তাবেও মন সায় দেয় না। সুতরাং সংসারের ভাবনা ছেড়ে বাঁচার ভাবনাই ভাবতে হয়, দেশকালের ভাবনা ছেড়ে নিজের, দশজনের ভাবনা ছেড়ে একার। বাঁচ্‌তে গিয়ে যদি

সংসারটারো দুঃখ দূর হয়ে যায় তো ভালোই, নইলে দুঃখ দূর করা সম্বন্ধে বাঁচ্‌বার লোকের দায়িত্ব নেই।

কিন্তু উঠানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দায় নাচ্‌বার লোক নিজে না মান্‌লেও উঠান তাকে মানাতে চায়। উঠান বলে, "তুমি যখন আমার উপরে দাঁড়িয়ে নাচ্‌ছ তখন আমার প্রতি তোমার এই দায়িত্বটুকু মান্‌তে হবে যে তুমি আমার ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই নাচ্‌ছ।" নাচ্‌বার লোক বলে, "সর্ব্বনাশ! নাচ্‌তেই আমি জানি, ঝাঁট দেওয়ার আমি কি বুঝি! আর ধূলো কি তোমার অল্প, না, আজকের! ঝাঁট দিতে বস্‌লে যুগ যুগান্তরেও শেষ হবে না, মাঝখান থেকে আমার নাচটাই মারা যাবে। না, ভাই উঠান, ধূলো ঝাড়্‌বার জন্যে নয়, নাচ্‌বার জন্যেই আমি নাচ্‌ছি।" উঠান একথা শুনে রাগ করে এমন শোধ তোলে যে নাচ্‌বার লোকের পদে পদে মনে হয়, ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি। কিন্তু সে যদি সৌখীন নটী না হয়ে থাকে তো কিছুতেই নাচ বন্ধ রাখে না, তার নাচের তাগিদ এতো প্রবল যে বারবার পা পিছলে পড়্‌লেও সে বারবার উঠে দাঁড়িয়ে নাচে।

বাঁচ্‌বার লোককে সংসার কোটী কণ্ঠে বলে, "আমার অনেক দুঃখ, অনেক অভাব, অনেক সমস্যা। তুমি কেন আমার প্রতি এই দায়িত্বটুকু স্বীকার করো না যে, তুমি আমার দুঃখ দূর কর্‌বার জন্যেই বাঁচ্‌ছো?" বাঁচ্‌বার লোক বলে "হায়! বাঁচ্‌তেই আমি জানি, দুঃখ দূর করার আমি কী বুঝি! আর দুঃখ কি তোমার দুটো-একটা, না, দু'এক যুগের! দুঃখ দূর কর্‌তে বস্‌লে কল্প-কল্পান্তরেও শেষ হবে না, মাঝখান থেকে আমার বাঁচাটাই মাটী হয়। না ভাই সংসার, দুঃখ দূর কর্‌বার

জন্মে নয়, বাঁচ্‌বার জন্যই আমার বাঁচা।" সংসার একথা শুনে অভিমান করে এমন যন্ত্রণা দেয় যে বাঁচ্‌বার লোকের বার বার মনে হয়, মরণ হলেই বাঁচি। কিন্তু সে যদি শক্ত পুরুষ হয়ে থাকে তো কিছুতেই লীলা বন্ধ রাখে না, তার লীলার তাগিদ এতো প্রবল যে, সে বার বার বাধ্য হয়ে দাসত্ব কর্‌লেও বার বার ছুটী নিয়ে লীলা কর্‌তে লেগে যায়।

সে আপত্তিও করে না, কৈফিয়ৎও দেয় না। সে বিষও নেয়, অমৃতও ছাড়ে না। সে আপনার আশপাশকে আত্মসাৎ কর্‌তে কর্‌তে আশপাশের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠ্‌তে থাকে, সেই বড়ো হয়ে ওঠাতেই তার সকল কর্ম্মের সার্থকতা। সেই আনন্দে সে যা-কিছু পায় তা গ্রহণ করে, যা-কিছু পায় না তা অর্জ্জন করে এবং সব কিছুকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিজেকে যে রূপটি দেয় সেই রূপটিই হয় তার দেওয়া, তার দান। তার ব্যক্তিত্বটাই হয় সংসারের প্রতি তার উপহার। এ ছাড়া কোনো কর্ত্তব্য কোনো দায় কোনো দেনা তার নেই। ত্যাগ বল্‌তে সে বোঝে তার বিকচ ব্যক্তিত্বের সৌরভ বিতরণ, তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের জ্যোতি বিকীরণ, তার উচ্ছল ব্যক্তিত্বের রসে উর্ব্বরীকরণ। ত্যাগ মানে ভোগের চেয়ে বড়ো হয়ে হয়ে ওঠা—ভোগকে বাদ দিয়ে নয়, ভোগকে রূপে পরিণত করে। রূপটাই ত্যাগ।

দেখ্‌তে গেলে সংসারের এতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। পূর্ণ প্রস্ফুট পদ্মের মধ্যে যেমন পঙ্কবহুলা পুষ্করিণী নিজেরি সৌন্দর্য্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়, বিচিত্রতম ব্যক্তিত্বের মধ্যে তেমনি সমস্যাময় সংসার নিজেরি ঐশ্বর্য্যরূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়। সে যে কেমন করে সম্ভব হলো এইটেই তখন রহস্যের মতন লাগে,

সে যে কী কী নিয়ে সম্ভব হলো এর তখন কোনো হিসাব খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল সে যে হয়ে উঠেছে এই সত্যটা তার সাত খুন আড়াল করে তাকে অনির্ব্বচনীয় রূপবান করে দেখায়। রূপ মাত্রেরি পিছনে একটি লোকসানের ইতিহাস, একটি খরচের তালিকা আছে। তার চরণ রাঙাবার জন্যে কীট প্রাণ দেয়, তাকে মুক্তা পরাবার জন্যে মানুষ সাগরে ডোবে, তাকে বেণী বাঁধাবার জন্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে। খরচের দিক থেকে খতিয়ে দেখ্‌লে অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না, মনে হয় নিছক বাবুয়ানা, ইচ্ছা হয় বন্ধ করে দিই খরচ, কিম্বা খরচের পরিমাণ বেঁধে দিই। বিরক্ত হয়ে বলি, "শা-জাহানের প্রজারা দুর্ভিক্ষে উচ্ছন্ন না হলে যদি তাজমহল গড়্‌বার কোটী কোটী টাকা না ওঠে তবে বন্ধ করো তাজমহল গড়া; আগে দুর্ভিক্ষ দূর হোক তারপরে টাকা থাকে তো ছোটো খাটো একটা দর্‌গা বা মাদ্রাসা গড়া যাবে যাতে দশ জনের উপস্থিত স্পষ্ট কিছু উপকার হয়, যা শত শত বৎসর ধরে শত শত রস-পিপাসুকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য রস জোগাবার জন্যে শা-জাহান বুড়োর বিরহে-বিগ্‌ড়ে-যাওয়া ধাতের মর্ম্মরীভূত প্রলাপ নয়।" কিম্বা উত্যক্ত হয়ে বলি, হাজার হাজার সৈনিককে মিশরে কচু কাটা হতে ফেলে পালিয়ে এসে ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার না কর্‌লে, বৎসরের পর বৎসর নিযুত নিযুত লোককে মেরে কেটে নিরন্ন নিরাশ্রয় করে ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলোকে পদানত না কর্‌লে, নিরপরাধ যোসেফিন্‌কে তালাক দিয়ে অনিচ্ছুক মেরিয়া লুইসাকে জোর করে বিবাহ না কর্‌লে যদি নেপোলিয়ন না হয় তো নাই হোক্ নেপোলিয়ন, তাকে নিয়ে নাই রচিত হোক শত সহস্র কথা কাহিনী গাথা ও কিম্বদন্তী; এতো

লোকসান দিয়ে চাইনে আমরা এতো বড়ো personality, আরো সস্তায় যদি আরেকটু মাঝারি গোছের বীর পুরুষকে পাই তো সেই আমাদের যথেষ্ট।”

কিন্তু সংসারের ফরমাস মান্‌বার পাত্র নয় তারা, যারা সংসারের মুখের কথার চেয়ে মনের কথাকে ঢের বড়ো সত্য বলে জানে। তারা জানে বসুন্ধরার প্রাণ চাইছে বীরকে; যে বীরকে চোখে দেখ্‌বে বলে সে কত প্রাণীকেই লোকসান দিলে; কতো Dinosaur, Diplodocus, Archaespteryx; কতো গাছ কতো পাখী কতো পশু! তার পরে মানুষ; তারপরে পুরুষোত্তম। লোকসান সে বড়ো সহজে দিতে চায় নি, সে প্রাণপণে খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, সে একটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখলে মূর্চ্ছা গেছে, কিন্তু যার হাতে সে পড়েছে সেও কি বড়ো সহজ পুরুষ! সে জানে তাকে দেখ্‌তে প্রকৃতির প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, তাই সে জোর করে বার বার তার লজ্জা ভাঙিয়ে তবে ছেড়েছে।

প্রকৃতির মধ্যে একটা হিসাবীয়ানা আছে, একটা কঞ্জুষপনা। পুরুষও যদি তার প্রশ্রয় দেয় তবে কেবল মোটা ভাত ও মোটা কাপড় কেন, হাওয়া খেয়ে বনে জঙ্গলে বাস, এই হবে তার শ্রেয়। ভাত খাওয়া মানে উদ্ভিদ্ হত্যা, কাপড় পরা মানেও উদ্ভিদ্ হত্যা। উদ্ভিদের চোখে দেখলে অতি বড়ো নিরামিষাশীকেও হিংস্র মনে হতে পারে এবং অতি বড়ো ত্যাগী পুরুষকেও ঘোর বিলাসী ও পরম স্বার্থপর ভেবে বসা অসঙ্গত নয়।

আমাদের যা আবশ্যক তা আমরা অর্জ্জন কর্‌বো, আমাদের যা আবশ্যকাতিরিক্তি তাই আমরা বর্জ্জন কর্‌বো। আবশ্যক থেকে বর্জ্জন করলে আত্মহত্যা কর্‌তে হয়, যদিও সংসার নানা ছলে ঐ

পরামর্শই দেয়। কী কী বাদ দিতে হবে এ সম্বন্ধে সংসারের অতি পরিষ্কার জ্ঞান, সংসার যে বড়ো টানাটানির সংসার। কিন্তু কী কী উদ্বৃত্ত দিতে হবে এ সম্বন্ধে সংসার নিরুত্তর, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের নিজেদের দিতে হয়। আমরা কী হয়ে উঠ্‌ছি তা আমরাই ভালো বুঝি, হয়তো আমরাও ভালো বুঝিনে, বোঝেন আমাদের নিজ নিজ অন্তরাত্মা, কিন্তু সে বোঝা আমাদেরি ঘরোয়া ব্যাপার, সংসারের সে ক্ষেত্রে প্রবেশ নিষেধ। সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই যে, সংসার আমাদেরকে মাল্‌মশলা জোগাবে ও আমাদের কাছ থেকে তৈরী জিনিষটি নেবে ; তৈরি করা সম্বন্ধে কোনো ফর্‌মাস কর্‌বে না।

চিরকাল এই চলে আস্‌ছে। শূন্যের দারিদ্র্যকে পিছনে রাখ্‌ছে একের ঐশ্বর্য্য। তাতে শূন্যেরো দর বাড়্‌ছে, সে বল্‌তে পার্‌ছে আমি নিতান্তই শূন্য নই, আমি একের পিঠে শূন্য! বসুন্ধরা শূন্যের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে একের সন্ধানে চলেছে, আর শূন্যেরা নিজেদের দর বাড়াতে বাড়াতে একের পিঠে সওয়ার হয়ে বস্‌ছে। কিন্তু তাদের দুঃখ যে কিছু মাত্র কমছে এমন নয়। শোনা যায় মহাপুরুষেরা নাকি সংসারের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্যে আবির্ভূত হন। মিথ্যা কথা। তাঁরা সংসারের দুঃখ বাড়িয়েই দিয়ে যান, তাঁরা বড়ো হয়েই প্রমাণ করে দিয়ে যান যে বড়ো হওয়া সম্ভব, তখন বড়ো-ত্বের অভাবে সংসার কাঁদে আর ভাবে আবার কবে একটি বড়ো-মানুষ দেখ্‌বো। কিন্তু বড়ো যে হয় সে নিজের বড়ো হওয়ার তাগিদে হয়, সংসারের অভাব দূর কর্‌বার তাগিদে নয়। সংসার তো ক্রসে না বিঁধ্‌লে, আগুনে না পোড়ালে, সোনাকে সোনা বল্‌তে চায় না। সংসার তো বিশৃঙ্খলা কমাতে

পার্‌লেই খুসী হয়, ঝঞ্ঝাট এড়াতে পার্‌লেই বাঁচে, পুরাতনকে ও পরীক্ষিতকেই নিয়ে তার সুবিধা। সে যে অসংখ্য প্রাণীর সংসার, সকলের সুবিধার দিকেই তার দৃষ্টি, তলার দিকেই তার টান, নিম্নতমের সুবিধার জন্যে উচ্চতমকে সে বলে "নেমে এসো"। কিন্তু সকলের সব সুবিধার চেয়ে বড়ো এক জনের বড়ো-হয়ে-ওঠা। সেই একজনেরি মধ্যে সকলে পায় আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে; মানুষের মধ্যে Dinosaur পায় তার মরণের অর্থ; মহামানবের মধ্যে হয় সর্ব্ব মানবের জয় জয়কার।

সেই জন্যে সংসারের দুঃখকে উপেক্ষা করে সংসারের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সংসারের বাধাকে বাহন করে সংসারের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠাই সংসারের প্রতি আমাদের চরম দায়িত্ব। আমাদের হয়ে-ওঠা সর্ব্ব জগতের সর্ব্ব কালের হয়ে-উঠা, আমরা কেবল তার উপলক্ষ মাত্র। আমরা না হলে আর কেউ উপলক্ষ হবে, মানুষকে না পেলে আর কোনো প্রাণীকে ডাক পড়্তো, ভারতীয়কে না পেয়ে ইউরোপীয়কে ডাক পড়েছে। যারা পরার্থপর হয়ে নিজেদের বিকাশ পেছিয়ে দেয় তারা পরকেও পেছিয়ে রাখে। নিজেদের দুর্ব্বল কর্‌লে দুর্ব্বলদের বল দেওয়া হয় না, সবাই মিলে চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকে। "এগোতে হয় সকলে এক সঙ্গে এক এক ইঞ্চি করে এগোবো, এক জন দশ ক্রোশ এগিয়ে দশ জনকে দশ ক্রোশ পিছনে রাখ্‌বো না;" এমন কর্‌লে এক ইঞ্চিও এগোনো হবে না, কেন না প্রকৃতির টান সর্ব্বদাই পিছনের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের টান সর্ব্বদাই পাতালের দিকে। নেতার কাজ আপন মনে এগিয়ে যাওয়া, নীয়মানেরা যদি পাল্লা না দিতে পারে তো নেতা ফিরেও তাকাবে না।

যুধিষ্ঠিরকে শেষ পর্য্যন্ত একলাই চল্‌তে হবে, একে একে অপর পাণ্ডবেরা পড়ে মর্‌লেও প্রাণাধিকা পাঞ্চালী চল্‌তে না পার্‌লেও সকলের হয়ে একা এগিয়ে যেতে হবে, সকলের সাধ অন্ততঃ একজনের মধ্যে পূর্ণ কর্‌তে হবে।

এক জনের নৃত্যের হিল্লোলে নাট-বেদীর ধূলা লুপ্ত হবার নয় কিন্তু পবিত্র হবার। এক জনের যৌবনের সৃষ্টিতে সংসারের দুঃখ দূর হবার নয় কিন্তু সার্থক হবার। দেশের একজনো লোক যদি সমস্ত শক্তির সহিত বাঁচে তবে তারি বাঁচায় দেশের ত্রিশ কোটী লোক বাঁচার স্বাদ পাবে, দেশের সব দুর্দ্দশাকে ম্লান করে তারি রূপ হবে দেশের যৌবনরূপ। একটি ভগীরথ ষষ্টি সহস্র সগরসুতকে উদ্ধার করেছিলেন, একটি মহামানব ত্রিশকোটী বালখিল্যকে আড়াল কর্‌বেন।

যতি ও সতী

কোন্ সমাজ ক'জন মাঝারি মানুষকে সুখ সুবিধা দিয়েছে তা নিয়ে সে সমাজের বিচার হয় না, ক'জন বড়ো মানুষকে আনুকূল্য করেছে ও কোন দরের বড়ো মানুষকে, তাই নিয়ে তার শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা। পঁচিশ লাখ মানুষের সমাজ নরওয়ে আর পাঁচ কোটী মানুষের সমাজ বাংলাদেশ। চারকোটী মানুষের সমাজ ফ্রান্স্ আর ত্রিশকোটী মানুষের সমাজ ভারতবর্ষ। কিন্তু বড়ো মানুষের সংখ্যা ও দর কোন সমাজে কতো তা আমরা হয়তো মানী দুর্য্যোধনের মতো মান্‌বো না, পৃথিবীসুদ্ধ সভাসদ্ কিন্তু শত কৌরবকে তাচ্ছিল্য করে পঞ্চ-পাণ্ডবকেই সভার পুরোভাগে বসাবে। অতো বড়ো প্রকাণ্ড একটা দেশে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ জগদীশ অরবিন্দ ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক সম্ভ্রম পাবার মতো মানুষ নেই, এই ক'টি সবে ধন নীলমণিকে নিয়ে আমাদের যা কিছু গৌরব। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এরকম আরো কয়েকটিকে পেয়েছি—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ। কিন্তু দেড় শত বৎসরের পরাধীনতা, ত্রি-খণ্ডতা ও অসচ্ছলতা সত্বে অতি ক্ষুদ্র পোলাণ্ডে এঁদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌বার মতো মানুষ বড়ো অল্প জন্মান নি।

বড়ো মানুষেরা অবশ্য সমাজের হুকুমে জন্মান না। কিন্তু যারা জন্মায় তাদের কেউ কেউ যদি বড়ো মানুষ হতে গিয়ে দুরতিক্রম্য বাধা পায়, যদি জন্মমাত্রেই তাদের আফিং ধরানো হয় ও বয়স না

হতেই তাদের লাঙলে জোতা হয় তবে তারা প্রাণান্তিক চেষ্টা করেও শেষ পর্য্যন্ত যেটুকু সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা পায় সেটুকু অন্য সমাজের মানুষের পক্ষে নগণ্য এবং তারা কোনো গতিকে একবার যদি দড়ি ছেঁড়ে তো ঊর্দ্ধশ্বাসে এতো দূর দৌড় দেয় যে সমাজের ত্রিসীমানার বাইরে চলে যায়। আমাদের দেশে গত দেড় সহস্র বৎসরে যতো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের অধিকাংশই সন্ন্যাসী ও যাঁদের দ্বারা দেশের চারুকলা রক্ষিত হয়ে এসেছে তাঁরা বেশ্যা। এঁদের বলিষ্ঠ প্রকৃতিকে সমাজ না দিয়েছে প্রতিভার পরিসর, না দিয়েছে প্রেমের পরিসর। তার ফলে এঁরা সমাজকে একেবারে ছেড়ে গিয়ে একেবারে বঞ্চিত তো করেছেনই, যাবার সময় সমাজের উপরে poison gas প্রয়োগ করে গেছেন, সে বিষবাষ্প সমস্ত সমাজটার শ্বাসরোধ করেছে। তাঁদের পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া বশত সমাজ যতিত্বকে ভেবেছে পৌরুষের চরম, সতীত্বকে ভেবেছে নারীত্বের সব কথা।

গৃহী নিজেকে মনে করেছে সন্ন্যাসীর তুলনায় অধম, ঘৃণ্য, হতভাগ্য। তার দেহ পড়ে থাকে গৃহে, মন পড়ে থাকে মঠে। সে ভাবে, যে দারাসুত নিয়ে সংসার সাগরে ডুবে মরছে সেই নিতান্ত ঠকে গেছে, আর যে কৌপীনবন্ত হয়ে বেলাভূমির বালুকা চষে বেড়াচ্ছে তার সুখের সীমা নেই। সংসার সাগরে ডুবে মরা সসন্তান প্রেমিক-প্রেমিকারো অদৃষ্টে ঘটে, কিন্তু সে মরায় এমন নির্লজ্জ কাপুরুষতা নেই—এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে ডুবে মরা, দুটোরি লোভে দুটোকেই খোয়ানো এবং দুর্ব্বলের ভগবানের দ্বারে মড়াকান্না কাঁদা। যে বিবাহে স্বোপার্জ্জিত প্রেমের কৃতিত্বময় আত্মসম্মান নেই সে বিবাহের

উপরে প্রতিষ্ঠিত গৃহধর্ম্ম কোনোমতে আচরিত জৈবধর্ম্ম মাত্র, তাতে মানুষকে বড়ো করে না, তাতে মানুষের নিজের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। ঘৃণার সৃষ্টি ঘৃণ্যই হয়।

গৃহিণী নিজেকে মনে করেছে গৃহত্যাগিনীর তুলনায় দেবী, অপাপবিদ্ধা, ভাগ্যবতী। তার সমস্ত সত্তা পড়ে থাকে নিজের সতী নামটুকু বাঁচানোর দিকে। সেটুকুতে এতোটুকু টোকা লাগলে কাঁচের বাসনের মতো ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়বে; তখন তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো রকম সৎ কাজে লাগাতে পারা যাবে না। সতীত্বের জন্যে নারীকে এতো দাম দিতে হয় যে নারীত্ব দেউলে হয়ে যায়। এতো সন্ত্রস্ততা এতো অন্যায়সহিষ্ণুতা এতো পরমুখাপেক্ষিতা, দৈবাৎ পাছে পর-পুরুষের ছোঁয়া লাগে এই ভয়ে দৈবের মুখ চেয়ে সারা জীবন কাটানো, দৈবাৎ যদি পরপুরুষ এসে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বে ছোঁয়া লাগিয়ে যান তবে বিনা অপরাধে চরম দণ্ড বিনা বিচারে নির্ব্বাসন —এ সকলের পরিণাম দেহ ছাড়া বাকী সমস্তটার বন্ধ্যাত্ব। মধ্য যুগের ভারতনারী কোটী কোটী সন্তানের মুগ্ধা জননী হয়েছে কিন্তু যে ক'টিকে মানুষ করেছে তাঁদের আঙুলে গোণা যায় এবং সেই ক'টিকেও সংসারে বাঁধতে পারেনি। মধ্যযুগের ভারত-নারীর সবচেয়ে বড়ো অক্ষমতা এই যে, সে পুরুষকে এমন একটি সংসার দেয়নি যে সংসারকে সে শ্মশানের চেয়ে শ্রদ্ধা করতে পারতো। সেই জন্যে পুরুষ হয় মনের সঙ্গে দেহকে টেনে নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, নয় দেহের সঙ্গে মনকে টেনে রেখে ঘরে ছট্‌ফট্ করেছে। সতী নারীকেও পুরুষ কামিনী বলে ঘৃণা করেছে, নারীর এর বাড়া অপমান কী হতে পারে!

প্রেমকে যারা জীবন থেকে বাদ দিয়েছে তাদের যেমন সন্ন্যাস তেমনি গার্হস্থ্য—এক ভস্ম আর ছার। কোনোটাই সৃষ্টিক্ষম নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ কেন এমন করে প্রেমকে জীবন থেকে বাদ দিলে? কারণ জীবন থেকে যৌবন চলে গিয়েছিলো, বৃদ্ধের পক্ষে অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছু রক্ষা করবার ছিল না। বৃদ্ধের সাধনা minimumএর সাধনা, বৃদ্ধ বলে ভূমায় সুখ নেই, অল্পে সুখ। তার ধর্মের সাধনা নিকৃষ্ট অধিকারীর প্রতিমাপূজা—ভগবানকে যেমন তেমন করে হাতে হাতে পেয়ে যাওয়া। তার অর্থের সাধনা কোনো মতে পেটে ভাতে পড়ে থাকা—এক খানা কটি-বস্ত্র এক মুঠা অন্ন। তার প্রেমের সাধনার শেষ কথা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। তার মোক্ষের সাধনার প্রথম কথা পুত্র ও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে সংসার থেকে প্রস্থান। তার সব সাধনাই যখন minimumএর সাধনা, তখন তার চরিত্রের সাধনাও যে minimumএর সাধনা হবে এর সন্দেহ নেই। তাই পৌরুষের চূড়ান্ত যতিত্ব, নারীত্বের চূড়ান্ত সতীত্ব। দুটোই দেহগত, দুটোই দৈবনির্ভর। পুরুষ তার দেহটাকে যতো রকমে পারে নিগ্রহ করে তার চরিত্র বাঁচায় এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি বাঁচাতে না পারে তবে তার বারো বৎসরের তপস্যা এক মুহূর্ত্তে ব্যর্থ হয়ে যায়। নারী তার দেহটাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যতোই অসংযত হোক তার সতীধর্ম্মে বাধে না, এমন কি সে স্বামী যদি অপর নারীর স্বামী হয়ে থাকে। কিন্তু সে নিজে অপর পুরুষের স্ত্রী হওয়া দূরের কথা, আপন অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি অপর পুরুষের দ্বারা স্পৃষ্টা বা দৃষ্টা হয় তবে তৎক্ষণাৎ হাঁড়ির ভাতের মতো ঘর থেকে ফেলা যায় নর্দ্দামায়। মৃত্যু মুহূর্ত্ত

পর্য্যন্ত সতী নামটা বাঁচিয়ে রাখা নারীর কীর্ত্তি নয়, ভাগ্য। তবে এ নিয়ে এতো জাঁক কেন? কারণ যে দৈবের উপর হাত চলে না সেই দৈবের প্রসাদ পেলে জাঁক করাটা অতি বৃদ্ধের অভ্যাস। সে যা কিছু পায় ভাগ্যক্রমে পায়, গায়ের জোরে পায় না। সতীপনা নিয়ে যাঁর এতো জাঁক তাঁর স্বামীটিকেও তিনি ভাগ্যক্রমে পেয়ে সধবা হবার জাঁক করেন এবং পাছে দুর্ভাগ্যক্রমে বিধবা হয়ে যান এই ভয়ে সেটিকে এমন আঁচলবাঁধা করেন যে সহমরণ উঠে যাবার আগে বিবাহিত পুরুষের পক্ষে দুঃসাহসিক কাজ করা যদি বা সম্ভব ছিলো, সহমরণ উঠে যাবার পর থেকে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত যখন মহাভারত ছিলো, তখন ভীষ্ম চিরকুমার ছিলেন; তাঁর মাতা গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বে আর এক বিবাহ ছিলো; তাঁর বিমাতা সত্যবতীর ব্যাসদেব ছিলেন কানীন পুত্র। সত্যবতীর বৈধ পুত্রদ্বয়ের অকালমৃত্যু ঘটায় তাঁদের পত্নীদের পুত্র দেবার জন্যে ভীষ্মকে আহ্বান করা হয়; তিনি অসম্মত হলে ব্যাসদেবকে ডাক পড়ে; তাঁর দয়ামায়া ছিলো; সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করলেন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী মাদ্রী ও কৌন্তেয় মাদ্রেয়দের যৌথপত্নী দ্রৌপদী ইত্যাদির বৃত্তান্ত স্বয়ং ব্যাসদেব অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করে গেছেন, আমি সে চেষ্টা করছিনে। আমি শুধু দেখিয়ে দিতে চাই যে মহাভারতের চিরকুমার সন্ন্যাসী ছিলেন না, বহুভর্ত্তৃকা বেশ্যা ছিলেন না। সন্ন্যাসী বা বেশ্যা আদৌ ছিলেন না এমন বলছিনে, ঐ দুই উপদ্রব থেকে কোনো সমাজই কোনো কালে মুক্ত ছিলো না, কিন্তু মহাভারতে এঁরা সমাজ থেকে একেবারে আলগা হয়ে সমাজকে বিকল ও বিকৃত

করেননি এবং সারা সমাজটার চারিত্রিক আদর্শকে প্রতিক্রিয়া-মূলক করেননি। মহাভারতে এঁরা সমাজের ভিতরে থেকে ব্যক্তিগত আদর্শ উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং ভিতরে থাক্‌বার দ্বারা সমাজকে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ নয় সুস্থ ও স্বাভাবিক রেখেছিলেন। যতিত্ব সে কালের পুরুষের পক্ষে চরিত্রবত্তার শেষ কথা ছিলো না, বিবাহ কর্‌লে পুরুষ নিজের চোখে নিজেকে ছোট বোধ কর্‌তো না, সংসার কর্‌লে নিজেকে ভারাক্রান্ত বোধ কর্‌তো না। সতীত্ব সে কালের নারীর সর্ব্বস্ব ছিলো না, সতীত্বের চেয়ে ঢের ব্যাপক ছিলো তার নারীত্ব। যে কারণে এ কালের নারীকে বেশ্যা বানিয়ে সমাজ ভারি একটা বাহাদুরি কর্‌লে ভাবে, সেই কারণে সে কালের নারীকে সতী বলে নিত্য স্মরণ কর্‌তো। মহাভারতে এতো রকম এতো নারীকে দেখি, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই জীবন্ত ও বিচিত্র; এক দল এক ছাঁচে ঢালা সতী নন, অন্য দল এক ছাঁচে ঢালা অসতী নন।

মৃচ্ছকটিকের সমাজেও বসন্তসেনা সম্ভব হতেন, তাঁকে বিবাহ দিয়ে সমাজ ধনী হতো। কিন্তু চণ্ডীদাসের সমাজে দেখি রামীর সঙ্গে বিবাহ দূরের কথা, সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সমাজের চক্ষুঃশূল। বুঝতে পারা যায় সমাজের বিষম পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে; সমাজ বর্দ্ধনশীলতাকে ছেড়ে রক্ষণশীলতাকে ঠাওরেছে ধর্ম্ম। সমাজ কোনো বিষয়ে কাউকে লেশমাত্র স্বাধীনতা দিতে চাইছে না, জাতকুলের দড়িদড়া দিয়ে সবাইকে কষে বেঁধেছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্ধকূপে একান্ন জনকে ঠেসে পূরেছে এবং ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ না হতেই গার্হস্থ্য চাপিয়ে দিচ্ছে বালকবালিকার উপরে। কিন্তু ক্ষুধাসঞ্চারের পূর্ব্বে আহার যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে

অহিতকর, প্রেমসঞ্চারের পূর্ব্বে বিবাহ তেমনি চরিত্রের পক্ষে অহিতকর। চরিত্র তো যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়নিরোধ সাপেক্ষ বা স্পর্শ প্রতিরোধ সাপেক্ষ নয়, চরিত্র মানে বল, চরিত্র মানে সাহস, চরিত্র মানে সংকল্প, চরিত্র মানে আত্মাভিমান। মানুষের চরিত্র মনুষ্যত্ব, পুরুষের চরিত্র পৌরুষ, নারীর চরিত্র নারীত্ব, ব্যক্তির চরিত্র ব্যক্তিত্ব। চরিত্রের না আছে সীমা, না আছে শেষ, না আছে চিরনির্দ্দিষ্ট আদর্শ। চরিত্র যৌবনধর্ম্মী, তাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হলেই বাঁচানো শক্ত হয়, তাকে ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে আপনি বাঁচে। আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে চরিত্রকে দেহগত করে দেহের আটঘাট বন্ধ করে মনকে বুভুক্ষু ও আত্মাকে আত্মপ্রকাশহীন করাটা চরিত্র রক্ষা বলে কথিত, কিন্তু অমন করে যাকে রক্ষা করা সম্ভব তা চরিত্রের অন্তঃসার নয় চরিত্রের খোলস। চীনা মেয়েদের মতো লোহার জুতো পরে পদদ্বয়কে রক্ষা করতে গেলে কঙ্কালদ্বয়কেই রক্ষা করা হয়, রক্ত মাংস ঝরে পড়ে। চরিত্রের উৎকর্ষ হয় প্রেমের জন্যে নব নব তপস্যা স্বীকার করে, প্রেমকে ছেড়ে গৃহধর্ম্মের চুণকামের নীচে জৈবধর্ম্ম আচরণ করে নয়, তাও ছেড়ে প্রবৃত্তির সঙ্গে রাত্রিদিন সংগ্রাম করে নয়।

প্রেমসঞ্চারের পূর্ব্বে বিবাহ চরিত্রের পক্ষে অহিতকর। তাতে পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব সচেতন হবার পূর্ব্বেই সচেতন হবার তাড়না হারায়, উদ্‌যোগী হবার পূর্ব্বেই উদ্‌যোগের সীমা পায়; দুষ্প্রাপ্যকে চাইবার পূর্ব্বেই অযাচিতের অধিকারী হয়। কিন্তু সমাজের তখন অষ্টম দশা উপস্থিত। প্রেমকে সমাজ অবিশ্বাস ও অসম্মানের চোখে দেখ্‌ছে। জাতিকুলের বিশুদ্ধতা

ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখস্বস্তিই তখন তার কাছে বড়ো। পারিবারিক প্রয়োজন ব্যতিরিক্ত সব প্রেমই পাপ এবং পুরুষপক্ষে যতিত্ব ও স্ত্রীপক্ষে সতীত্বই চরিত্রবত্তার শেষ সীমা। প্রেম-স্ফূর্ত্ত তপস্যায় যে চরিত্রের উৎকর্ষ সে চরিত্র ছিলো অর্জ্জুনের, সে চরিত্র প্রতিবারের প্রেমে প্রতিবার সমৃদ্ধতর সুন্দরতর সবলতর হয়েছিলো। সে চরিত্র ছিলো উমার—সে চরিত্র দীর্ঘকালের তপস্যার দ্বারা কামের ফেনিলতাকে প্রেমের প্রগাঢ়তায় ঘনীভূত করেছিলো। কিন্তু সমাজ যে দিন প্রাণের ভয়ে জাতকুলের দরজা বন্ধ করে একান্নবর্ত্তী পরিবারের একান্নটা কুঠ্‌রিতে লুকিয়ে বেড়াতে সুরু কর্‌লে সেদিন থেকে স্থির হয়ে গেলো অর্জ্জুন বা উমা হবার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না, ব্রহ্মচর্য্য ভাসিয়ে দিয়ে অল্প বয়সের ছেলে অল্প বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে আন্‌বে এবং ঐ দু'টি পুতুলের বিয়ের সম্বন্ধ ওদের পক্কপ্রবীণ পিতামাতারা নির্ণয় কর্‌বেন। গৌরীকে তপস্যার সুযোগ না দিয়ে অষ্টমবর্ষে দান কর্‌বার কথা উঠ্‌লো, সাবিত্রীকে পতি মনোনয়ন কর্‌তে না দিয়ে সতী হবার উপদেশ দেওয়া গেলো। এবং রামের মতো সুবোধ ছেলে হতে যাকে বলা হলো রামের মতো প্রেমের তপস্যা থেকে তাকে মূলেই বঞ্চিত করা হলো। পুরুষের পক্ষে তখন একমাত্র adventure গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়া, নারীর পক্ষে তখন একমাত্র adventure গৃহ ছেড়ে পথে বিপণি সাজানো।

কিন্তু adventureএর দাম যারা দিতে পারে তারা তো মাঝারি স্ত্রী পুরুষ নয়, তারা আর সকলের চেয়ে ঢের বড়ো শক্তিসম্পন্ন। কিছু একটা অসম্ভবকে সম্ভব না কর্‌লে এতো

বড়ো শক্তি তৃপ্তি মানে না। সমাজের দশজনের যদি সুবুদ্ধি থাকে তো তারা অসুবিধা সয়েও এদের সমাজে রাখ্‌তে রাজি হয়, সমাজের একেবারে বাইরে যেতে দিয়ে নিজেদের আরো বড়ো সর্ব্বনাশ করে না। সেই জন্যে মহাভারতের যুগে পুরোদস্তুর সন্ন্যাসী বা পুরোদস্তুর বেশ্যা যদি বা ছিলো তারা এতো নগণ্য ছিলো যে মহাভারতকার তাদের উল্লেখযোগ্য মনে করেননি অথচ এমন সব স্ত্রী পুরুষকে নিয়ে গল্প জমিয়েছেন যাঁরা আমাদের এখনকার সমাজে জন্মালে ও এখনকার সমাজে স্থান পেলে সমাজরক্ষীদের আতঙ্ক সঞ্চার করেন। বিবেকানন্দের মতো পুরুষসিংহ গুরুজনের সুখস্বস্তির খাতিরে খুকী বৌটি নিয়ে পুতুল খেলার সংসার পাতবার পাত্র ছিলেন না; সমাজে যদি স্বোপার্জ্জিত প্রেমের স্বল্পতম সুযোগ ও লেশমাত্র প্রসিদ্ধি থাক্‌তো তবে তাঁর এতো বড়ো চরিত্র তাঁর নিজের দিক থেকে এমন অচরিতার্থ ও সমাজের দিক থেকে এমন ব্যর্থ হয়ে যেতো না, প্রেমের মধ্যে পুষ্পিত হয়ে বাৎসল্যের মধ্যে মধুময় হয়ে ঋষির জীবনে পরিণতি পেতো। শঙ্কর সম্বন্ধেও সেই কথা। দেড় হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজ লাখ লাখ মাঝারিকে বহিষ্কৃত করে দুর্ব্বল হয়ে গেছে বলে হাহাকার করা একটা ফ্যাসান ও অন্য সমাজের মাঝারিদের শুদ্ধিপূর্ব্বক অন্তর্ভুক্ত করা সেই ফ্যাসানের অঙ্গ। কিন্তু দেড় হাজার বৎসর ধরে আমাদের সমাজ যে শঙ্কর বিবেকানন্দের মতো কতো বিরাট পুরুষকে বীরলভ্য প্রেমের সুপ্রশস্ত পরিসর না দিয়ে আরো বিরাট হতে দেয়নি এবং তাঁদের জীবনকে সর্ব্বরসে পূর্ণ কর্‌তে না দিয়ে তাঁদের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে, সে কথা চিন্তা কর্‌লে দারুণ দুঃখ

হয়। যে সর্ত্তে আমাদের সমাজ গৃহী হতে বলে সে সর্ত্তে মাঝারিরা অতি আহ্লাদে সম্মতি দেয়। কিন্তু সমাজকে যাঁরা কৃতার্থ কর্‌তে পার্‌তেন তাঁরা সম্মত হন না। কারণ তাঁরা পরের চাপানো সংসারদায়ের মধ্যে নিজের আনন্দের দায়িত্ব খুঁজে পান না, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিপুল বন্ধনের মধ্যে অনুরাগ-সাধনের মুক্তি খুঁজে পান না, যে সীতার অর্জ্জনে বীরত্ব নেই, রক্ষণে বীরত্ব নেই, সে সীতাকে নিয়ে ভোগের জীবনে বীরত্ব খুঁজে পান না। রামমোহন রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্যতিক্রম, কিন্তু ইউরোপে জন্মালে এঁরা এই প্রতিভা নয়ে আরো বিচিত্র হতে পার্‌তেন। আর আমাদের বেশ্যাদের মধ্যে যে সব মহীয়সী মহিলা দেহনিবদ্ধ সতীত্বের অত্যাচারে সমাজছাড়া হয়ে প্রেম ও সম্মানের অভাবে অসার্থক হচ্ছেন ইউরোপে জন্মালে তাঁরা কীর্ত্তি রেখে যেতে পার্‌তেন। "শ্রীকান্তে"র রাজলক্ষ্মীকে স্বামী না দিয়ে, অভয়াকে সন্তান না দিয়ে ও উভয়কে সম্মান না দিয়ে সমাজ নিজেই ঠকে গেলো। কিন্তু এই ঠকে যাওয়া আজকের নয়, হাজার দেড়েক বৎসর এই সব চলে আস্‌ছে। কে কার খবর রেখেছে!

মাঝারি মেয়েদের জন্যে তৈরি সমাজে সতীত্ব একটা আস্ফালনের বিষয়। সে জন্যে তাঁরা সারা জীবন আর কিছুই কর্‌বার অবসর পাননি, শুধু দেহটিকে একাধিক পুরুষের ছায়া থেকে সশঙ্কে বাঁচিয়েছেন। সেই একটি পুরুষকেও তাঁরা অর্জ্জন করেননি, বর্জ্জন কর্‌তে পারেন না এবং সেই একটি পুরুষ যদি আর এক জনের হন, তবু আর এক জনের সঙ্গে ভাগ করে স্বামী সেবা করেন। যে কারণে পুরুষকে স্ত্রৈণ বলে

অবজ্ঞা করা হয় সেই কারণে নারীকে সতী বলে গগন বিদীর্ণ অর্থাৎ বক্তৃতামঞ্চ (তথা রঙ্গমঞ্চ) বিদীর্ণ করা হয়। চরিত্র বলতে যতো কিছু বোঝানো উচিত যেমন যতির বেলা তেমনি সতীর বেলা সমাজ তাদের কোনোটারি বিচার করে না, বিচার করে কেবল কার দেহে কার ছায়া পড়েছে। এই ছায়াটুকু এড়াবার জন্যে বজ্র-আঁটুনির অন্ত নেই, এ জন্যে আস্ত নারীটিকে ছেঁটে ফেলে তার "untouched by hand" দেহটিকে মেলিন্স্ ফুডের মতো অন্তঃপুরে প্যাক্ করা হয়েছে, সে দেহের মধ্যে জলীয় বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নেই, সে না করে বিদ্রোহ, না দেখায় চাঞ্চল্য, না করে সৃষ্টি, না দেয় স্বাদ। সে দেহ নিয়ে নিতান্ত শবসাধক ছাড়া আর কারুর কোনো আনন্দ নেই। যে সমস্ত নারীটিকে পেতে ভালবাসে সে এই প্রাণলেশহীন সতীটিকে কাঁধে ঝুলিয়ে শিবের মতো কতো কাল ঘুরবে! এ যে মনে পর্য্যন্ত কোনো দিন একটা পাপ করতে পারে না, এতো প্রাণহীন! চরিত্র হারাবার সাহস যার নেই চরিত্র তার কোথায়! উন্মুক্ত ক্ষেত্রে যার অগ্নিপরীক্ষা নেই কোথায় তার সৌন্দর্য্য, কোথায় তার তেজ, কোথায় তার সংযম! ঠুলি পরে যে ঘোড়া গাড়ী টানতেই জানে তার সওয়ার হয়ে যুদ্ধে নেমে সুখ নেই। আমাদের সতীদের নিয়ে আমরা কোনো অসাধ্যসাধনে বল পাইনে, তাদের ভীরুতা আড়ষ্টতা ও শুচি-বাতিক-গ্রস্ততার চোরাবালিতে পা দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে তলিয়ে যাই, তাদের দাসী-মানসিকতার দ্বারা সংক্রমিত হয়ে দেশশুদ্ধ পুরুষ কতো রকম দাসত্ব করি। দেহটিকে লজ্জাবতী লতা করে আমাদের সতীরা স্বামীটিকে ছেড়ে এক পা চলতে পারেন না, দশজন পরপুরুষের সঙ্গে এরোপ্লেনের

পাইলট্ বা সিনেমার অভিনেত্রী হবেন এমন কথা স্বপ্নে ভাব্‌লে স্বপ্নে জিভ্ কাটেন এবং এমন ঘন ঘন অপহৃতা হন যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের মেয়েরা ভাবে ভারতের মেয়েরা কি পেড়ী-পুটুলী, না, ছাতা-ছড়ি যে টুপ করে তুলে নিলেই উঠে আসেন এবং অচিরেই ভাঙা-ছেঁড়া অবস্থায় ফিরে পাওয়া গেলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা যান।

পুরুষের চরিত্র তার ঐশ্বর্য্যে নারীর চরিত্র তার মাধুর্য্যে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সর্ব্বগুণের সমন্বয়। চরিত্রের মূল প্রেম। যার প্রেম যতো স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যতো প্রবল, যতো গভীর, তার চরিত্র ততো ঐশ্বর্য্যময়, ততো মাধুর্য্যময়। নাই বা হলো সে যতি, নাই বা হলো সে সতী। মানুষ বহুবার বহুজনকে ভালোবেসে শত রূপ উপলব্ধির দ্বারা শতদলের মতো ফুটবে। তার দেহ সে কাকে দেবে তার মন সে কাকে দেবে, সেই তা একবার নয় দু'বার নয় শতবার স্থির করবে। তার প্রতি-ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা সে শত জনের স্পর্শন-দর্শন-মননের সুধায় তৃপ্ত করতে পারবে না তো সিক্ত করবে। তার চরিত্র সম্বন্ধে তার অন্তর্যামীর একটি আইডিয়া থাক্‌তে পারে, সেই আইডিয়াকে সে সমাজের দশজনের দেওয়া সাজা সয়েও নিত্য নব রূপ দিতে লাগ্‌বে। প্রেমমূলক চরিত্র নিজের নিয়ম নিজেই ঠিক্ করে নেয়। কিন্তু সমাজের নিয়মের সঙ্গে সে নিয়ম সব সময় তাল রাখে না বলে সমাজকে সে স্পষ্টতঃ আঘাত করে অলক্ষ্যে ঘাতসহ করে। যে সমাজের যতো অন্তর্দৃষ্টি, প্রেমকে সে সমাজ ততো বড়ো পরিসর দেয়, চরিত্রকে সে সমাজ ততো কম ছাঁচে ঢালাই করে। ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডের সমাজ প্রেমকে বিশ্বাস ও সম্মান করে সবচেয়ে বড়ো

পরিসর দিয়েছে। ইংলণ্ডে সন্ন্যাসীর প্রভাব নেই, বেশ্যার প্রতিপত্তি নেই, গৃহস্থ ও যতির মধ্যে সতী ও অসতীর মধ্যে ব্যক্তিগত উনিশ বিশ আছে, শ্রেণীগত ভেদরেখা নেই। ফ্রান্সের সমাজে প্রেমের পরিসর ইংলণ্ডের চেয়ে কম, সন্ন্যাসীর প্রভাব ও বেশ্যার প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু আমাদের এখনকার সমাজের মতো নয়, তখনকার সমাজের মতো যখন বসন্তসেনা ও চারুদত্ত ছিলেন। ফ্রান্সের demi-mondeরা বিবাহ করলে সমাজে স্থান পায়, বিবাহ না করলেও সমাজের আশ্রয় হারায় না; সমাজের স্বনিষ্ঠ পুরুষদের তারাই প্রেরণা দেয়, কীর্তিমানদের তারাই সখী-সচিব। ইউরোপের সর্ব্বত্র আমাদের এখনকার সমাজের তুলনায় প্রেমের স্বাধীনতা ও প্রেমিকের দায়িত্ব বেশী এবং কোথাও পর্দ্দা নেই। সমাজের নারীমাত্রেরি কাছে সমাজের পুরুষমাত্রেই দৃষ্টিসূত্রে এক প্রকার মাধুর্য্য পায় যা পর্দ্দা গুণ্ঠিত দেশে পুরুষের ভাগ্যে জোটে না। নারীর মাধুর্য্যই পুরুষের শক্তি। ইউরোপের পুরুষ কোথা থেকে এতো শক্তি সংগ্রহ করে, এমন ঐশ্বর্য্যময় হয়ে ওঠে, দূর থেকে আমাদের তা অভাবনীয় এবং ইউরোপের এতো দেশ থাকতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যে কেন এতো দিকে এতো কৃতী হয়েছে দূর থেকে তারো আমরা দিশা পাইনে। বলা বাহুল্য passionএর সঙ্গে painএর সোদর সম্বন্ধ। ইউরোপের লোক আমাদের তুলনায় ঢের অসুখী। কিন্তু এতো অসুখী বলেই এতো সৃষ্টিশীল। বড়ো মানুষের জন্ম বড়ো বেদনায়।

পুরুষের ঐশ্বর্য্য ও নারীর মাধুর্য্য এরি প্রকৃষ্ট অনুশীলনের পথে আমাদের চলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণই সৎ, শ্রীরাধাই সতী।

সমাজ যদি এঁদের স্থান না দেয় তা হ'লেও সমাজের মধ্যেই এঁদের স্থান করে নিতে হবে, সমাজের বাইরে চলে গেলে চল্‌বে না। এক জন হতে হলে দশ জনের এক জন হতে হয়, দশ জনের বাধা কাটিয়ে উঠে, দশ জনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে!

প্রতিমাভঙ্গ

আমাদের সমাজে পুরুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মতো ঐশ্বর্য্যময় হয়ে ওঠা যদি বা সম্ভব, নারীর পক্ষে শ্রীরাধার মতো মাধুর্য্যময়ী হয়ে ওঠা গোড়াতেই অসম্ভব। আমাদের মেয়েরা জন্মাবধি স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে পুতুলের মতো লালন কর্‌তে শেখে, যখন স্বামীপদ-প্রাপ্ত মানুষটিকে পায় তখন সেই মানুষটিকে মানুষ ভাব্‌তে পারে না, ভাবে সে একটি বিগ্রহ, সেই বিগ্রহটিকে অবলম্বন করে তাকে আইডিয়ার সাধনা কর্‌তে হবে। সেটি যদি একটি গাছও হয় তবু আমাদের মেয়েরা পরম সন্তোষের সঙ্গে বলে, "এই গাছই আমার প্রাণেশ্বর। এ কি যেমন তেমন গাছ! এর সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ, মৃত্যুর পরেও সে সম্বন্ধ কাটবার নয়, ছায়ার মতো এ র অনুগত হওয়াই আমার ধর্ম্ম।" স্বামীটি যদি একটি সদ্যোজাত শিশুও হয় তবু আমাদের মালঞ্চ-মালারা তাকেই য়ে ধন্য। যদি একটি অশীতিপর বৃদ্ধও হয় তবু আপত্তি নেই। যদি স্ত্রীর প্রতি তার এক বিন্দু প্রেম না থাকে, যদি তার একাধিক স্ত্রী থাকে, যদি তার দেহময় ব্যাধি মনোময় পাপ ও চরিত্রময় কলঙ্ক থাকে, তবু সে স্বামী অর্থাৎ বিগ্রহ। স্ত্রীর আইডিয়ায় সে পরম রূপগুণবান্‌ দেবতা।

ভগবানকে আমরা আপন মনের আইডিয়া দিয়ে চমৎকার সরল করে এনে সাপ ব্যাঙ্‌ কাঠ পাথরের উপর আরোপ কর্‌তে অভ্যস্ত। আমাদের সেই প্রতিমাপূজার ধাতটিকে আমাদের মেয়েরা আরেকটু পরিণতির দিকে নিয়েছে। তারা আপন মনের

দেবতাটিকে অমানুষেরো উপর আরোপ করে ভাবে এই আমার দেবতা! ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা যেমন নিকৃষ্ট অধিকারী প্রেম বিষয়ে আমাদের মেয়েরাও তেমনি নিকৃষ্ট অধিকারী। প্রতিমাপূজার একটা মস্ত সুবিধা এই যে তাতে মানুষকে অনেক দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আমি যদি বলি, এই ফাউণ্টেন পেনটিই আমার ভগবান, একেই সহায় করলে আমি মাউণ্টেন লঙ্ঘন করতে পারি, তবে কার এতো সাধ্য কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে যে এই ফাউণ্টেন পেনটি আমার ভগবান নয় বা এটিকে পকেটে নিয়ে আমি আল্প্স্ মাউণ্টেনে হাওয়া খেয়ে আসতে পারিনে। কেবল সাধকরা একটু হেসে বলবেন, "নিশিদিন যাঁর বিরহে নয়নে অশ্রু বহে, সর্ব্বস্ব পণ করেও যাঁকে পাইনি, পাবার আশা পর্য্যন্ত রাখিনে, তাঁকে তুমি কতো সহজে পেয়ে গেলে দেখে হিংসা হয় কিন্তু।" আমাদের মেয়েরাও অনেক দুঃখ থেকে বেঁচে গেছে। অন্য দেশের মেয়েরা সারাজীবন পথ চেয়েও ভালোবাসার জনকে পায় না, যাকে পায় তাকে ভালোবাসতে পারে না বলে কাঁদে, ভালো না বাসলেও যাকে নিয়ে যথা লাভ ভাবে, তাকেও বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। জন্মজন্মান্তর! তারা নিজের স্বামীটিকে নিজে অর্জ্জন করতে পারে তো করে, নিজে রক্ষণ করতে পারে তো রাখে, নিজে বিসর্জ্জন দিতে পারে তো দেয়। প্রেমসংক্রান্ত সমস্যা এক একটি মেয়ের এক এক রকম, সমাজ তাদের নিয়ে নিজে তো জ্বলে পুড়ে মরেই, তাদেরো জ্বালা পোড়া দূর করতে পারে না, সমাজের উপর তাদের ও তাদের উপর সমাজের নালিশের ইয়ত্তা নেই। অন্য দেশের মেয়েদের তুলনায় আমাদের মেয়েরা এমন কী দুঃখিনী!

আমাদের মেয়েদের দশজনকেও যদি এক সঙ্গে বেঁধে একটা কুষ্ঠরোগীর গলায় লটকে দেওয়া যায় তো দশজনেই পালা করে এমন পতিপূজা করবে যে পৃথিবীর কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সুদে আসলে বাড়তে থাকবে, দশজনেরি জন্মজন্মান্তরকাল সেই একজনই যে ইষ্টদেবতা এ সন্দেহ তাদের একজনেরো জাগবে না এবং পতিটি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করলে সতীরা কে আগে জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করবে তাই নিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দেবে। সহমরণ উঠে যাওয়ায় আমাদের বিধবাদের দুঃখ বেড়েই গেছে। একদিনে মরে গেলেই সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেতো, প্রতিদিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা উপবাস ও বিরহ কাঁহাতক পোষায়! তবু তাদের আশ্বাস এই যে বিগ্রহটি স্থানান্তরিত হলেও আইডিয়াটি তো মনের অন্তর হয় না, সেটিকে রোমন্থন করতে করতে বাকী জীবনটা কোনো মতে কেটে যায়। কোনো মতে টিকে থাকাটা যাদের জাতীয় আদর্শ তাদের যেমন সধবাত্ব তেমনি বৈধব্য। স্বামী জীবিত থাকলেও কি স্বামীর প্রেম পাবার কোনো নিশ্চয়তা থাকে? দৈবাৎ যদি পাওয়া যায় তো সৌভাগ্য, না পাওয়া যায় তো দুর্ভাগ্য। দৈবের উপরে তো মানুষের হাত চলে না। আমাদের মেয়েরা দৈবকেই সার বলে জেনেছে বলে একটি দুঃখে সকল দুঃখ ভুলেছে—সেটি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। সেই জন্যে তাদের একমাত্র প্রার্থনা, "হে ঠাকুর, আর যেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়!" তাদের দেশের মেয়ে তো তারা! দেশের সকলেরি প্রার্থনা, আর যেন জন্মাতে না হয়!

বিবাহ আমাদের সমাজ ধর্ম্মের অঙ্গ। না করলে ধর্ম্মহানি—বিশেষ করে মেয়েমানুষের পক্ষে। ধর্ম্মের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ

কিসের! শ্রেয় ও প্রেয় কখনো কি এক হতে পারে! বিবাহের সময় কেউ প্রেমের প্রত্যাশা মনেও আনে না, প্রেম না দিয়ে ও না পেয়ে যদি সারাটা জীবন কেটে যায় তবু কেউ একটু আশ্চর্য্যও হয় না। সতী স্ত্রীর যথা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করে গেলেই হলো— স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই সতী স্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য। স্বামীর বিয়োগে স্বামিকুলকে। নিষ্কাম ধর্ম্ম যদি বলো তো আমাদের মেয়েরাই তা আচরণ করে থাকে বটে। এমনটি পৃথিবীর কোথাও নেই, তা সত্যি। স্বামী নামক একটি আই-ডিয়ার কাছে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আত্মসমর্পণ—তার মধ্যে না আছে সে নিজে না আছে স্বামীপদ প্রাপ্ত মানুষটি। দু'পক্ষের কোনো পক্ষই মানুষ নয়—একটি কল, অন্যটি কল্পনা। "নৌকা-ডুবি"র কমলা রমেশ মানুষটিকে কোনো দিন ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছিলো রমেশকে বিগ্রহ করে স্বামীকে। যেই জান্‌লে বিগ্রহটি আসল নয় নকল, অমনি তার ভালোবাসার বিগ্রহ বদ্‌লালো, এতো দিনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এক নিমেষে মিথ্যা হোলো দুঃস্বপ্নের মতো। একটা দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত মনে স্থান পেলে না। সে তো মানুষ নয়, সে হিন্দু নারী! সে তো মানুষকে ভালোবাস্‌তে পারে না, সে মূর্ত্তিকে ভালোবাসে। কমলা যদি রমেশকে ভালো-বেসে তার সঙ্গে থাক্‌তো তবে নিজেকে কলঙ্কিনী মনে করে ঘৃণার একশেষ কর্‌তো এবং রমেশকেও কলঙ্কের সাথী বলে ঘৃণা কর্‌তে ছাড়তো না—অথচ সে সেই রমেশ যে ছিলো একদিন তার দেবতা। ভারতের মেয়ে স্বামী ছাড়া অপর পুরুষকে যদি ভালোবেসে ফেলে তো অপর পুরুষকে স্বামী ভেবে শ্রদ্ধা কর্‌তে পারে না, পূর্ব্ব স্বামীকে পরপুরুষ বলে উড়িয়ে দিতে পারে না, বিবাহ-ভঙ্গ ও

পুনর্ব্বিবাহের কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না, সমাজকে তার এতো শ্রদ্ধা যে সমাজের ভিতরে থেকে সমাজের শ্রদ্ধা দাবী করবার ভাবনা মনেই আনতে পারে না।

তাই কমলা যদি রমেশকে ভালোবেসে থাকতো তবে আপনা হতেই বেশ্যা হয়ে যেতো। অবশ্য একনিষ্ঠ বেশ্যা। বেশ্যা হয়ে যাওয়া সব সমাজেই আছে, কিন্তু বেশ্যা হয়ে যাওয়া বলতে যে কতোখানি বোঝায় তা আমরা যেমন বুঝি কেউ তেমন বোঝে না। ইউরোপের মেয়ে যদি অপর পুরুষকে ভালোবাসে তবে সে সমাজের দণ্ড স্বীকার করে কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সমাজকে আঁকড়ে ধরে, ছেড়ে যাবার প্ররোচনাকে কিছুতেই আমল দেয় না, স্বামীর ঘর ছেড়ে যার ঘর করে তাকে সমাজের চোখে তার স্বামী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, সমাজের চোখের সঙ্গে নিজের চোখকে এক করে নিজেকে পাপীয়সী ও প্রিয়কে পাপের সাথী বলে ঘৃণা করে না। কমলা যদি ইউরোপে জন্মাতো রমেশকে ভালোবেসে ভালোবাসার সাজা সইতো, বিবাহের উপায় না থাকলে কেঁদে ব্যর্থ হয়ে যেতো, কিন্তু নলিনাক্ষের ঘর করতে রমেশের ঘর ছাড়তো না কিম্বা রমেশের জন্যে বেশ্যা হয়ে যেতো না। শুধু সধবাদের পক্ষে কেন, আমাদের বিধবাদের পক্ষেও পুনর্ব্বিবাহ বেশ্যা হয়ে যাবার সামিল পাপ। স্বামী তো তাদের কাছে মানুষ নয় যে একটি মানুষকে হারালে বা ভুলে গেলে আরেকটি মানুষকে বিবাহ করবে। স্বামীটি তাদের আপনার মনের কল্পনা, সে কল্পনা কেবল একটি উপলক্ষকে আশ্রয় করবার, সে উপলক্ষটির বিনাশে বা বিচ্ছেদে অন্য উপলক্ষের কথা উঠতেই পারে না, উঠলে কল্পনার মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা এসে পড়ে।

স্বামী কেবল একজন, বিবাহ কেবল একবার, কল্পনা কেবল একাশ্রয়ী।

স্বামী কেবল একজন বটে, কিন্তু "এক" কথাটি যতো বড়ো "জন" কথাটি ততো বড়ো নয়। অর্থাৎ জনটি রমেশ নলিনাক্ষ রাম শ্যাম তাল গাছ শাল গাছ শালগ্রাম শিলা মাটীর ঢেলা যেই হোক এক হলেই হলো। আমাদের স্ত্রীরা যে বিশেষ করে আমাদেরকেই ভালোবাসে এমন নয়। বিশ বছর এক সঙ্গে বাস করবার পর হঠাৎ যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে আমরা তাদের স্বামী নই, তাদের স্বামী নৌকাডুবিতে হারিয়ে গেছে তবে তৎক্ষণাৎ তারা বিধবা হয়ে যাবে, তাদের ভালোবাসা পাত্রান্তরিত হবে। যে ভালবাসা পাত্রান্তরিত হতে পারে সে ভালবাসা যে কোন দরের তা তলিয়ে দেখে কাজ নেই। নিখিলের সঙ্গে ন'বছর ঘর করবার পর বিমলা যদি জানতো যে বিয়ের রাত্রে নৌকাডুবি হয়ে সমস্ত উলটপালট হয়ে গেছে, নিখিল তার কেউ নয়, সন্দীপই তার স্বামী, তবে বিমলা সন্দীপের পায়ের ধুলা নিয়ে "ঘরে বাইরে" শেষ করতো, নিখিলের কী দশা হবে ভুলেও ভাবতো না, মৃত্যুমুখীন নিখিলকে মরতে রেখে যেতো। তা যখন সত্য নয় তখন বিমলা ঘুরে ফিরে নিখিলেরি হতে বাধ্য। নিখিল যে সন্দীপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা সন্দীপের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসে এটা আকস্মিক। নিখিল যদি তার দাদাদের মতো মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হতো আর সন্দীপ হতো সাক্ষাৎ যীশুখ্রীষ্ট ও বিমলা-গত প্রাণ তবু বিমলা শেষ পর্য্যন্ত নিখিলেরি থাকতো এবং পরপুরুষকে কিছুকাল মনে মনে ভালোবেসেছিলো বলে হয় তো কঠিন আত্মনিগ্রহ করতো। আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে মন যদি

পাপ করে তো দেহ পায় সাজা, সুতরাং আত্মনিগ্রহ মানে দেহনিগ্রহ।

"ঘরে বাইরে" বইখানার শেষ যে ওরকম হবে তা নিয়ে গোড়া থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। বিমলাকে হারাবার ইচ্ছা বা আশঙ্কা নিখিলের একেবারে নিরর্থক, হিন্দুনারী কখনো হারায় না। এবং যদি হারায় তো এমন হারায় যে তাকে হৃদয়ে ফিরে পেলেও ঘরে ফিরে পাওয়া অসম্ভব—সে নিজেই রাজি হয় না। বিমলাকে নিখিলের হারাবার প্রশ্নই ওঠে না, বিমলা তো কোনো দিন নিখিলের ছিলো না, সে তার স্বামীর। "ভারতবর্ষীয় বিবাহের" মূল তত্ত্ব এই যে, সমাজ নারীর জন্মাবধি তার মনে স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে বীজ থেকে লতা করে তুলবে, তারপর একদিন সেই কল্পলতাটিকে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে যে কোনো পুরুষমহীরুহের প্রতি উন্মুখ করে দেবে, তারপর লতাটি তাকে জড়াতে জড়াতে চলবে ও তার মৃত্যু হলেও তাকেই আশ্রয় করে রইবে। সেই ফাঁকে যদি একটু প্রেম হয় তো ভালোই, নইলে প্রেমের জন্যে সমাজের মাথাব্যাথা পড়েনি, স্ত্রীপুরুষের একত্র হওয়াটাই সমাজের পক্ষে আবশ্যক, তাদের প্রেমটা সমাজের পক্ষে অবান্তর। সমাজ একনিষ্ঠতা দাবী করে, প্রেম দাবী করে না।

দুটি মানুষকে একত্র করে দিলে তাদের মধ্যে প্রেম জন্মানো স্বাভাবিক, অন্তত নারীর দিক থেকে। প্রেম জন্মায়ও, কিন্তু সে প্রেমের মধ্যে ব্যক্তির স্থান নেই। তাই নিখিলের আত্মাভিমানে বাধে। সে ভাবে বিমলা নিজের মনের স্বামী প্রতিমাটিকেই ভালোবাসছে, সেই প্রতিমাটির আড়ালে নিখিল পড়েছে ঢাকা। নিখিল চায় বিমলা তাকে নিখিল বলেই ভালবাসুক, বিশ্বের স্বয়ম্বর

সভায় তাকে নিখিল বলেই বরণ করুক। এক হাতে তাকে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা রেখে অন্য হাতে তাকে গ্রহণ করুক। কিন্তু বিমলা যে হিন্দু নারী, সে যে সমাজের হাতে গড়া কল, তার গায়ে সন্দীপকে লেলিয়ে দিয়ে কল নেই। আর যদি একবার বিগ্‌ড়ে যায় তো একেবারে ছারখারে যাবে। সুতরাং নিখিলকে যাবজ্জীবন প্রতিমার আড়ালে ঢাকা পড়্‌তে হবে, এই তার বিমলাকে বিবাহ করার শাস্তি। নিখিল যে নিখিল বলেই এক জনের প্রিয়, এ উপলব্ধি তার কোনো দিন হবার নয়। মা'র ভালোবাসাতে বোনের ভালবাসাতে, মেয়ের ভালবাসাতে, পক্ষপাত নেই বলে পুরুষ স্ত্রীর ভালোবাসাতে পক্ষপাত খোঁজে; কিন্তু এমনি আমাদের স্ত্রীরা যে তাদের ভালোবাসাতেও পক্ষপাত নেই, তারা স্বামীকে ভালোবাসে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে, তাদের কাছে রমেশ নলিনাক্ষ রাম শ্যাম কাঠ পাথর সবাই "হইলে হইতে পারিত" স্বামী।

কিন্তু বিমলা যে বিমলা বলেই একজনের প্রিয় এ উপলব্ধি তার হবার। কেন না পুরুষকে আমাদের সমাজ আইডিয়া-বাহী কল করে নি, নিখিল ইচ্ছা করলেই তার দাদাদের মতো স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্যের হতো বা আরেকটি বিয়ে করে সুয়ো রাণীটিকে বিশেষ করে ভালোবাসতে পারতো। তা যে সে করেনি এরি থেকে প্রমাণ হয় সে বিমলাকে বিমলা বলেই ভালোবেসেছে, নিজের মনের প্রতিমার আড়ালে ঢাকেনি। এটা অবশ্য সোজা প্রমাণ নয়, বাঁকা প্রমাণ, তবু মোটের উপর এটা মিথ্যা নয় যে আমাদের সমাজে পুরুষই পক্ষপাতী প্রেম থেকে বঞ্চিত, পুরুষই :খী, নারী নয়। পুরুষের এই একটি দুঃখের কাছে নারীর সকল দুঃখই তুচ্ছ। ব্রাহ্ম সমাজের মহিম যে সৌভাগ্য পেলে হিন্দু

সমাজের কোনো স্বামীই সে সৌভাগ্য পায় না, কারণ হিন্দু সমাজের অবলারা সবাই এক একটি মৃণাল, প্রত্যেকেই এক একটি প্রতিমা পূজারিণী। মাটীর ঢেলাকেও তারা পুরুষ শ্রেষ্ঠের মতো ভালো-বেসে পূজা করবে। পুরুষের পৌরুষের উপর তাদের এতোই সামান্য দাবী যে আমাদের সমাজে পুরুষমাত্রেরি স্ত্রী জোটে, তার সব অযোগ্যতা উপেক্ষিত হয়, সে যদি পাগল অন্ধ ভিক্ষুক হয়ে থাকে—না, যদি মাতাল লম্পট হত্যাকারী হয়ে থাকে—তবু তাকে দেবতা জ্ঞান করবার একটি মানুষ থাকবেই, সে তার মৃণাল। "শ্রীকান্তে"র অন্নদাদিদির স্বামীদেবতাটি যদি ব্যক্তিবিশেষ বলে ব্যক্তিবিশেষের প্রিয় হয়ে থাক্‌তো তবে কথা ছিলো না, কিন্তু সে তা নয়, সে তার স্ত্রীর আইডিয়ার প্রতীক মাত্র এবং তার স্ত্রী সমাজের দম-দেওয়া কল-ই, হোক না কেন সে যতোই উঁচুদরের কল। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে এইখানে আমাদের তফাৎ যে আমরা আবালবৃদ্ধ যেমন ভগবান বলে আমাদের আপন মনের অনড় প্রতিমাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ভগবানের উপর আমাদের দাবীকে ছোটো করি, আমাদের বনিতারাও তেমনি তাদের আপন মনের অনড় প্রতিমাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমাদের উপর তাদের দাবীকে ছোটো করে। দাবী ছোটো হলে পাওনাও ছোটো হয়, যে ভগবানের আভাস আমরা পাই ও যে পৌরুষের নমুনা আমাদের মেয়েরা দেখে দুই সমান খর্ব্ব, দুই সমান অধম। এবং দাবী ছোটো হলে যে দাবী করে তারো বৃদ্ধি হয় না, নিকৃষ্ট অধিকারী নিকৃষ্ট থেকে যায়, আমাদের পৌত্তলিক সাধকরা ঋষি হন না, আমাদের পৌত্তলিক প্রেমিকারা উমা-সাবিত্রী হয় না। আমাদের মেয়েদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারাও

নেহাৎ লক্ষ্মীটি, তাদের প্রেম কল্‌মী গাছের ফুল, তাদের প্রেমাস্পদরা পোষা ভ্রমর, তাদের সৃষ্টি স্বাদু কিন্তু স্বাদবৈচিত্র্যহীন! অন্নদাদিদি বা মৃণাল প্রাচীন ভারতে জন্মালে ব্যক্তিবিশেষকে ভালোবাসবার বা পূজা কর্‌বার সুযোগ পেতো। নির্ব্বিশেষকে ভালোবেসে ও পূজা করে যতো মাধুর্য্যময়ী হলো তখন হতে পার্‌তো তার বেশী মাধুর্য্যময়ী। আমাদের মেয়েরা ব্যক্তিবিশেষকে ভালোবেসে স্বামী কর্‌বার সুযোগ পায় না, এইটেই তাদের পরম দুর্ভাগ্য, পেলে তাদের মাধুর্য্যের সীমা থাকৃতো না, তারা জগতের মাঝে কতো বিচিত্র বিচিত্ররূপিনীই হতো, কেবল আমাদের ঘরের কোণের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র হয়ে নারীজন্মকে ব্যর্থ কর্‌তো না।

মধুর প্রেমের সাধনায় প্রতীককে নয় ব্যক্তিকে কর্‌তে হয় উপলক্ষ। কিন্তু প্রেমকে নারীপক্ষে নৈর্ব্যক্তিক কর্‌বার জন্যে আমাদের সমাজ নারীমাত্রকেই জন্মাবধি পক্ষাহত করেছে। অবরোধ ও অশিক্ষার চেয়ে এই ব্যাধিই তাদের বৈরী, মৃত্যুর আগে এর কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই তাদের। এক জনেরো সাধ্য নেই নিষ্কৃতি পায়, এইটে আরো বড়ো দুর্ভাগ্য। শিক্ষাসত্ত্বেও না, স্বাধীনতাসত্ত্বেও না। সেই জন্যে "শেষ প্রশ্নে"র কমলকে শরৎচন্দ্র অর্দ্ধ ইংরেজ কর্‌লেন জন্মতঃ। "গৃহদাহে"র অচলা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় নি, ব্রাহ্ম সমাজ যে হিন্দু সমাজেরি সন্তান, প্রতিমা-পূজার ধাত তারো যায়নি। "শেষ প্রশ্নে"র কমল ব্রাহ্ম সমাজে কেন, ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজেও সম্ভব হতো না। আশ্চর্য্য শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি। যেমন ভগবান সম্বন্ধে তেমনি প্রেমসম্বন্ধে—যে বলে আমি পেয়ে গেছি, সে ঠকে গেছে। যে বলে আমি পাবার আশা রাখি সেও

নিজেকে ঠকায়। পাবার জন্যে অবিরাম সাধনাটাই যা পাওয়া। সেই পাওয়াতেই সাধককে সুন্দর করে, তেজস্বী করে, আনন্দময় করে, তপস্বিনীকে তপ্ত কাঞ্চনের আভা দেয়। সাধনা যার যতো দুর্ব্বল, পাওয়া তার ততো নগণ্য। সমাজের চিরকালই দুর্ব্বলতার দিকে টান, কেবল আমাদের সমাজের নয়, সব সমাজের। কিন্তু সাধকের গতি দুর্ব্বলতার থেকে প্রবলতার দিকে, মৃত্যুর থেকে অমৃতের দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে। আমাদের সমাজে সাধকের সংখ্যা ও দর অল্প বলেই আমাদের দুর্গতি। আমাদের সমাজে প্রেমের সাধনা করবার দুঃসহ ব্রত যে কমল-রা নেবে তারা যেন নিজের মনের মরীচিকাকে দিয়ে প্রাণভরা তৃষা মেটাবার ভাণ করে না, তারা যেন রসের সন্ধানে ছুটে প্রাণ দেয় তবু ঢিল দেয় না, তারা যেন এক প্রেমের স্বাদ থেকে আরেক প্রেমের স্বাদে যায়, কোনোটাতেই আসক্ত হয় না। প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াই তো যথার্থ একনিষ্ঠতা, প্রেমিকের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া সোনা নয় সোহাগা। একজনের কাছে যদি সব স্বাদ মেলে তো একজন, নইলে "এক" কথাটা অবান্তর, "জন" কথাটাই আসল। নিখিলের কাছে যতো দিন বিমলা অমৃত পাবে নিখিলই ততোদিন তার প্রিয়, তার স্বামী ; তার পরে সন্দীপ, তারপরে আর কেউ ; তারপরে নিখিলই যে আবার তার প্রিয় হবে এমন মাথার দিব্যি নেই ; নিখিল হয়তো আর কারুর প্রিয় হবে নয় তো কারুরি না। কান্না দূর করবার জন্যে তো প্রেম নয়, কান্না সার্থক করবার জন্যেই প্রেম। নিখিল কাঁদবে, তবু তার এই গৌরব খোয়াবে না যে, সে প্রতিমার দ্বারা ঝাপসা হয়নি, সে পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। সে বিমলার মনগড়া স্বামীদেবতা

নয়, সে নিখিল, সে যা সে তাই। বিমলা যদি নিজের প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে নিখিলকে প্রিয় করে তো ভালোই, নইলে বিমলার মনের প্রতিমার প্রতি বিমলার একনিষ্ঠতা বিমলাকেও বড়ো করবে না, নিখিলকেও না।

(১৯২৮)